তৃতীয় অধ্যায়

রাজশেখর বসুর ছোটগল্পে হাস্যরস

(১)

ত্রৈলোক্যনাথের পর বাংলা হাস্যরসের ধারায় উজ্জ্বল নক্ষত্র রাজশেখর বসু। পরশুরাম ছদ্মনামে তিনি বাংলা সাহিত্যে পরিচিত। পৌরাণিক পরশুরাম কুঠার হাতে একদা ক্ষত্রিয় নিধনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এ যুগের পরশুরাম যুগের নানা অসঙ্গতি, অসত্য, কলুষতাকে দূরীভূত করতে কুঠার হাতে বাংলা ছোটগল্পের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক, একটি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা আর ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অথচ গল্প লেখার আসরে তিনি যখন অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন তিনিই হয়ে উঠেছেন হাস্যরসিক।

রাজশেখর বসু বর্ধমান জেলার বামুন পাড়া গ্রামে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের আদি বাড়ি নদীয়া জেলার উলা বীরনগরে। তাঁর পিতা ছিলেন চন্দ্রশেখর বসু এবং মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী। প্রথমে অবস্থা ভালো না থাকলেও পরবর্তীকালে পিতা চন্দ্রশেখর দ্বারভাঙ্গা নামক দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছিলেন। সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় মাঝে মাঝে তিনি লিখতেন। তাঁর লেখা 'সৃষ্টি আদিকার তত্ত্ব', 'প্রলয়তত্ত্ব', 'বেদান্ত প্রবেশ' ইত্যাদি সেকালে বেশ জনপ্রিয় ছিল। বলাবাহুল্য রাজশেখরের বড় হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে পিতা চন্দ্রশেখরের প্রভাব যথেষ্ট কার্যকর হয়েছিল।

রাজশেখর বসুরা ছিলেন চার ভাই ও পাঁচ বোন। রাজশেখর ছিলেন ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয়। সেই সূত্রেই পরিবার ও প্রিয়জনের কাছে তিনি মেজদা নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ছোটবেলা কেটে ছিল বিহারের দ্বারভাঙ্গায়। হিন্দী ভাষার মাধ্যমে তাঁর ভাষা শিক্ষা শুরু হয়েছিল। ছোটবেলায় দুধ দিলে বলতেন 'ম্যায় দুধ নেহি পিউঙ্গা', বায়না ধরতেন 'হাতির তলায় বসে দুধ খাবো'। উপায়ন্তর না দেখে দ্বারভাঙ্গা রাজের হাতির তলায় বসিয়ে তাকে মাঝে মাঝে দুধ খাওয়ানো হতো। রাজশেখর বসুর শৈশবের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর বড়ভাই শশিশেখরের লেখা 'শারদীয়া যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রাজশেখরের ছেলেবেলা' প্রবন্ধটিতে। এই প্রবন্ধ থেকে জানা যায় :

''একবার চন্দ্রশেখর (পিতা) বললেন ফটিকের (রাজশেখরের ডাকনাম) নাম ঠিক হয়ে গেছে। মহারাজ (লক্ষ্মীশ্বর সিংহ) জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার দ্বিতীয় ছেলের নামও একটা রাজশেখর হবে নাকি? কী শেখর হবে?'' আমি বললাম 'ইওর হাইনেস, যখন তাকে আশীর্বাদ করেছেন, তখন আপনিই তার শিরোমাল্য। আমি আপনার সামনে তার নামকরণ করলাম রাজশেখর—দ্বারভাঙ্গার মহারাজা যার শিরে আছেন। রাজা মহেন্দ্র পালের সভাকবির নাম থেকে এই নাম নেওয়া হয়নি।''[১]

এরকম আরো নানা ঘটনার কথা জানা যায় উক্ত প্রবন্ধ থেকে। যেমন :

''মা যখন তার হাতে খেলনা দিতেন, টিনের ইঞ্জিন রবারের বাশি, স্প্রিং-এর লাট্টু এক ঘন্টার মধ্যেই রাজশেখর লোহা পাথর ও হাতুরি দিয়ে ভেঙ্গে দেখত ভেতরে কি আছে—কেনো বাজে? আবার যখন কলকাতা থেকে স্প্রিং এর নতুন ইঞ্জিন আসতো, মা রাজশেখরের হাতে দেবার সময় বলতেন, দেখিশ যেন ভাঙ্গিশ না। অমনি চার বছরের ছেলের মুখ অভিমানে গম্ভীর হয়ে গেল—খেলনা নেবে না! তারপর মা বললেন, এই নে যা খুশী কর! তখন নিজে খানিকক্ষণ চালিয়ে রাজশেখর ইঞ্জিনটার মুন্ডপাত করতো।''[২]

''রাজশেখরের বয়স যখন চার, তখন ফুলস্টপ দিতে শিখলো। দুজন লোক বড় কাগজ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো আর পায়জামা চায়নাকোট পরা রাজশেখর একটি পেন্সিল নিয়ে ছুটে এসে কাগজটা ফুটো করে পেন্সিল ভেঙ্গে দিতো। এই তার হাতে খড়ি। পকেটে আটোমেটিক পেন্সিল, হাতে লোহার স্ট্র্যপ, কখনো বা সোঁটা।''[৩]

শশিশেখর আরেকটি মজার ঘটনা জানিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধটিতে :

''যখন দ্বারভাঙ্গায় এলাম তার বয়স তখন সাত আন্দাজ। আমি লুকিয়ে বাবার বাক্স থেকে বেগম সিগারেট চুরি করে খাই। রাজশেখর যখন আর একটু বড় হল বল্লাম 'ওরে ফটিক, একটা সিগারেট টান দিকি, এতে ভারী মজা।' রাজশেখর একটু টেনে ফেলে দিতো।

... বুড়ো বয়সে যখন দিল্লীতে অপারেশন হলো, বেচারি যন্ত্রনায় ছটফট করছে। ডাক্তার সন্তোষকুমার সেন পেশেন্টকে অন্যমনস্ক করবার জন্য বললেন, 'সিগারেট খান একটা।' পেশেন্ট বল্লে, 'খাইনা—' কখনও খাননি? রাজশেখর উত্তর দিলো, 'আমার দাদা একবার লুকিয়ে খাইয়ে ছিল ছেলেবেলায়।' ডাঃ সেন বললেন, 'You ought

to have continued it!' এবং পেশেন্ট ও ডাক্তার হেসে উঠলেন। যাঁরা বলেন, রাজশেখর হাসে না, তাঁরা দেখলেন রোগ যন্ত্রণাতেও কি রকম মজা করবার ঝোঁক। আট বছর বয়সে মাছ মাংস ঘৃণায় ত্যাগ করলো। লোকে বললো, রাজশেখর বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হবে। ইঁদুর কলে পড়লে ছেড়ে দিত, মারতো না।''[৪]

রাজশেখরের ছেলেবেলার প্রথম সাত বছর কাটে খড়গপুরে। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গায় রাজ স্কুলে তিনি পড়াশুনা করেন এবং সেখান থেকে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। এরপর তিনি পাটনায় আসেন এবং কলেজে ভর্তি হন। এখানেই আই.এ পড়ার সময় ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের বড় ভাই মহেন্দ্র প্রসাদ তাঁর অন্যতম সহপাঠী ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ পড়ার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন এবং প্রেসীডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হন। এই সময়েই মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। যাইহোক ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেমিষ্ট্রী এবং ফিজিক্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহকারে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর একবছর পর অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রে প্রথমস্থান অধিকার করে রাজশেখর এম.এ পাস করেন। তার পর দুবছর আইন বিদ্যা পড়ে বি.এল পরীক্ষায় পাশ করেন তিনি। কিন্তু পাশ করাই সার, আইন ব্যবসাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করা মোটেই তাঁর ভালো লাগেনি। এর কারণ অনুসন্ধান করে শ্রী প্রমথনাথ বিশী বলেছেন :

''রাজশেখর প্রকৃতিগতভাবেই সৎ এবং ভদ্র। শুধু একথা বললেই সম্পূর্ণ বলা হয় না। তিনি সংযত শান্ত এবং অন্তর্মুখী মানুষ। তাকে দিয়ে গবেষণাদির চিন্তাপ্রধান কাজই ভালো হতে পারে একথা তিনি নিজেও বেশ বুঝেছিলেন।''[৫]

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অনেকে মনে করেন যে রাজশেখর বসু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। আসলে তিনি ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসুর ছাত্র। বি.এ ক্লাসে পড়াকালীন রাজশেখর জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে কিছুদিন পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। যাইহোক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তার সহযোগিতায় বেঙ্গল কেমিকেলের একজন কেমিষ্টের পদে নিযুক্ত হন তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই বেঙ্গল কেমিকেলের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘ দিন সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের পর স্বাস্থ্যের কারনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

রাজশেখর বসুর সাহিত্য রচনার পিছনে এই বেঙ্গল কেমিকেলের কিছুটা হলেও অবদান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির অধিকাংশ কাজকর্ম হত বাংলায়, হিসেবপত্র বাংলায় রাখা হত। ওষুধ পত্রের নামকরণে রাজশেখর বাংলা নামের পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন পোকা বা কীট মারার একটি

ওষুধের নাম তিনি রেখেছিলেন 'মারকীট'। এভাবে বাংলা ভাষা চর্চায় হাতে খড়ি হয়েছিল রাজশেখরের। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই জানিয়েছেন :

> ''বাল্যের কবিতা রচনার সখের কথা বাদ দিলে এই প্রতিষ্ঠানেই আমার সাহিত্য রচনার আরম্ভ, এইখানেই তাঁর হাতে খড়ি বলা যায়। অবশ্য মূল্য তালিকা তৈরি করা বা বিজ্ঞাপন লেখাকে যদি কেউ সাহিত্য বলে গ্রাহ্য করেন। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'এর আগে আমার যা কিছু বাংলা রচনা তা এর বাইরে কিছু নয়।''[৬]

(২)

রাজশেখর ছিলেন এক বিচিত্র ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে যিনি হাস্যরসের কারবারী তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও আমুদে হবেন। কিন্তু রাজশেখর সেরকম ছিলেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন গুরুগম্ভীর রাশভারী ধরনের লোক। অনুরূপাদেবী রাজশেখরের ব্যক্তিত্ব উদঘাটন করেছেনে এইভাবে :

> ''আমার বিশ্বাস ছিল পরশুরাম আমার পরম স্নেহাস্পদ বিশুর স্বামী, তার লেখার মতই হাসিখুশিতে ভরা অত্যন্ত সামাজিক, চালাক চটপটে একটি আমুদে লোক হবেন। কিন্তু ওকে দেখে মনে মনে ভাবলাম—ইনি কি করে ওইসব অপূর্ব হাস্যরসের আঁধার হলেন। এ যেন সরষার মধ্যে ত্যাল'।....তাঁর বেঙ্গল কেমিকেলের গৃহে, পরে বহুবার তাঁর নিজ গৃহেও যাতায়াত করে তাঁর লেখার মতই তাঁর গভীর সৌজন্যপূর্ব গাম্ভীর্যময় সুমিষ্ট ব্যবহারে তাঁর অন্তরের কোন গভীরে যে তাঁর অন্তঃসলিল সহজাত হাস্যরস প্রবাহিত ছিল তার সম্যক সন্ধান লাভ করেছি। আর দেখেছি তাঁর ধ্যানমগ্ন শোকগম্ভীর সে রূপটুকু। বাস্তবিক একাধারে এমন শান্ত সমাহিত এবং স্নিগ্ধরস চরিত্র সংসারে বড় কম দেখা যায়।''[৭]

তাঁর পোশাক, পরিচ্ছদ, চালচলন, কথাবলা সবেতেই এই ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটেছে। রাজশেখর বসুর দায়িত্ববোধ ছিল অসাধারণ। কাজের ক্ষেত্রে এতটুকু ফাঁক রাখতে তিনি পছন্দ করতেন না। অফিসে ঢোকার পর বাড়ির কথা সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন। অফিস ও বাড়ি এ দুটিকে তিনি কখনই এক করে ফেলেননি। অফিসে তিনি যেমন সদা কর্মব্যস্ত থাকতেন, তেমনি বাড়িতে থাকার সময়ও একজন সাংসারিক মানুষ হিসেবে তিনি নিজের অবস্থানটিকে ঠিক

রেখেছিলেন। আতিথেয়তায় কোনোরকম ঘাটতি তাঁর ছিল না। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য স্মরণীয় :

> ''তাঁর সমাদরের মধ্যে আড়ম্বর ছিল না, তবে সহৃদয়তার কখনও অভাব দেখিনি। সেখানেও দেখেছি দুটি একটি কথায় আলোচনার জট ছাড়াতে তাঁর স্বাভাবিক নিপুণতা। আমরা হয়তো অনেক কথা বললাম, মুহূর্তে তাঁর মধ্যে থেকে আলগোছে আসল কথাটি তুলে নিলেন। এও তাঁর শিক্ষা ও স্বভাবের ফল। তাঁর বাড়িটিও তাঁর গায়ের খদ্দরের কোটের মতো অনাড়ম্বর প্রশস্ত, বিলাসিতা নেই অথচ সম্পূর্ণ বাসোপযোগী।''[৮ক]

রাজশেখর বসুর ছিল একটি আড্ডাধারী মন। তাঁর বিভিন্ন গল্পে এই আড্ডাধারী মানসিকতার পরিচয় মেলে। চোদ্দ নম্বর পাশী বাগানে রাজশেখর বসুর একটি আড্ডাখানা ছিল। তাঁর গল্পে এই আড্ডখানাটি ১৮ নম্বর হাবসী বাগান বলে পরিচিত। ১৪ নম্বর পাশীবাগান লেনের বসুভবনের এই আড্ডা নিয়ে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী লিখেছেন :

> ''একদিন সে [শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন] তাঁর কাজ করবার ঘরের পাশেই ওখানকার বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে।...এই আড্ডায় অনেক গুণী-পন্ডিত বিদগ্ধ লোকের আসা-যাওয়া চলত। যজ্ঞেশ্বর [অর্থাৎ এই যজ্ঞের প্রধান] ছিলেন রাজশেখরবাবুর ছোটভাই গিরীন্দ্রশেখর বসু। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুলেখক শশিশেখর বসু একজন নিয়মিত আড্ডাধারী ছিলেন। তাঁর গল্প টীকা-টিপ্পনী এবং মন্তব্য ছিল অরুচি রুগীরও রুচিকারক। আমি যেদিন প্রথম সে আড্ডায় প্রবেশ করলুম সেদিন রাজশেখরবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।... দুই একদিন যেতে না যেতেই ... দেখা পেলুম।...প্রথম দৃষ্টিতে রাজশেখরবাবুকে যত গম্ভীর লোক বলে মনে করেছিলুম, দু-একদিনের পরিচয়েই বুঝলুম তাঁর বাইরেটা যতই গাম্ভীর্যের বর্মে ঢাকা থাকুক না কেন, ভেতরে রসের প্রস্রবণ বয়ে চলেছে।...আড্ডায় হাসির ফোয়ারা ছুটত। তার উপর বড়দা অর্থাৎ শশিশেখরের টিপ্পনীর রসান চলত।...সব সময় শ্লীলতার গন্ডি মেনে চলত না। রাজশেখরবাবু খোলাখুলিভাবে যোগ না দিলেও বেশ উপভোগ করতেন বলে মনে হত।'' (যুগান্তর সাময়িকী, ৮ মে ,১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ) [৮খ]

প্রায় প্রতিদিনই এখানে আড্ডা বসত, রবিবার দিন এই আড্ডাখানা বিশেষ জমে উঠত। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষেরা এই আড্ডাখানাকে জমিয়ে তুলত। এই আড্ডাখানার নাম ছিল 'উৎকেন্দ্র সমিতি'। প্রথমে এর একটা ইংরাজী নাম থাকলেও বাংলায় এই নামটি রেখেছিলেন

রাজশেখর বসু। এই মজলিষে চা, দাবা তাসের সংগে চলত মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস এবং সাহিত্যের নানা আলোচনা।

রাজশেখর বসু বরাবরই ছিলেন অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ অর্থাৎ যাকে কিনা বলে perfect disciplinarian. রাজশেখর বসুর নিয়মনিষ্ঠা সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রাজশেখরের মৃত্যুর পর 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখেছেন :

> ''সন্নিহিত প্রতিবেশী আমরা। কটা বেজেছে যদি ঘড়ি মেলাতে চাও, রেডিও খুলে ...মেলাবার দরকার নেই, রাজশেখরবাবুকে দেখ। দেখ, উনি বাজারে বেরুলেন কিনা। তাহলে সাতটা। নিচের বৈঠকখানা থেকে উঠে গেলেন কিনা উপরে। তা হলে নটা। খেতে বসেছেন নাকি? তা হলে এগারোটা।''[৮গ]

রাজশেখরের চরিত্রের আরেকটি বড় দিক ছিল এই যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীর-স্থির প্রকৃতির এবং কিছুটা আড়ালে থাকতে ভালোবাসতেন। রাজশেখরের বাল্যকাল প্রবন্ধে শশিশেখর এক জায়গায় লিখেছেন :

> '' দ্বারভাঙায় পড়ার সময় রাজশেখরের বয়স যেমন বাড়তে লাগল, তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য এবং সায়েন্স বাড়তে লাগল। আমরা ভাই-ভগ্নী ও বাঙ্গালি ঝি রাই, চন্ডী ও গোবিন্দ বামনিকে নিয়ে থিয়েটার করতাম। রাজশেখর রামতরণের দোকান থেকে বাংলা ছানা দামের নাটক পছন্দ করে আনত, ও নিজে পার্ট না নিয়ে ডিরেক্শন দিত। আমি কৈকেয়ী সাজতাম, রাই ঝি দশরথ সেজে আমার মান ভাঙাত।...রাজশেখর কখনো বিদ্যা ফলাত না। পেটের মধ্যে বিদ্যে পুঁজি করা থাকত। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তবে বলত।''[৮ঘ]

রাজশেখর বসু মিতবাক গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ হলেও কোনো কোনো সময় তাঁর সেই গাম্ভীর্যের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতো নির্ভেজাল ছেলেমানুষিপনা। অমিতাভ চৌধুরী তাঁর 'অদ্বিতীয় রাজশেখর' গ্রন্থে জানিয়েছেন :

> ''অনেক বদবুদ্ধি তাঁর মাথায় খেলতো এবং তা নাতনির ছেলেকে শিখিয়েও দিতেন। দীপঙ্করের ছেলেবেলায় স্কুলের দারোয়ান, যে শুধু 'জয় সীতারাম' বলতো, তাকে বলার জন্য তিনি শিখিয়ে দিলেন 'জয় রাধাকৃষ্ণ' বলতে। তা বলতেই দাড়োয়ান ভীষন চটে যেতো। একবার এক ভদ্রলোক রাজশেখরকে টেলিফোন করেছেন—,'কবিরাজ মশাই আছেন'। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন 'খুব দই খাও'। এই মিসচিফের মূলে হচ্ছে

কবিরাজী চিকিৎসায় দই বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। বেচারী কবিরাজী-চিকিৎসার রোগীকে তাই খাইয়ে দিচ্ছিলেন।''[৯]

রাজশেখর বসুর ব্যক্তিত্বের আরেকটি দিক আমরা জানতে পারি তাঁর দৌহিত্র দীপঙ্কর বসুর লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন :

''তাঁর জীবনের একটি গোপনতম খবর তিনি একমাত্র আমার মা অর্থাৎ শ্রীমতি আশাকেই বলেছিলেন। খবরটির প্রকাশের যখন সময় হয়—১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের পর তখন আমি নিতান্তই শিশু। খবরটি মা রাজশেখর শতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতা দূরদর্শনে প্রচারিত এক অনুষ্ঠানে প্রথম সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। সুবিখ্যাত 'মানিকতলা বোমার' ঘটনা যার হোতা অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, তার সমস্ত বোমার শুধু ফড়মুলাই নয়, যাবতীয় মালমশলা দাদুই সরবরাহ করতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর এই নীরব যোগদান কেউ কোন দিন জানে নি। ধরা পড়লে অবধারিত জেল। এই ভয়ংকর ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন।''[১০]

এখান থেকে স্বদেশপ্রেমিক হিসেবে রাজশেখর বসুর একটি নতুন পরিচয় আমাদের সামনে উদঘাটিত হয়।

এবারে সাহিত্যিক রাজশেখর বসুকে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তবে আরো আগে জানা দরকার সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবের প্রকৃত প্রেক্ষাপটটি কী ছিল। যে মানুষটি ছিল বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক ও ল্যাবরেটরির বড় মাপের ও মানের পরিচালক, সাহিত্য জগতে তাঁর প্রবেশ সত্যিই এক বিস্ময়কর ঘটনা। বিজ্ঞানী হলেন শিল্পী, একজন বৈজ্ঞানিক হলেন সার্থক গল্পকার, রসিক মানুষ। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কীভাবে এই অসম্ভব সম্ভব হল?

রাজশেখর বসু যে পরিবারে জন্মেছেন এবং বেড়ে উঠেছেন সাহিত্যচর্চার একটি উন্মুক্ত পরিবেশ সেখানে ছিল। পিতা চন্দ্রশেখর, দাদা শশিশেখর, ছোট ভাই গিরিন্দ্রশেখর প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল এবং তারা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এমন পরিবারে জন্মে রাজশেখরের সাহিত্য জগতে প্রবেশ মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

রাজশেখর বসু যে সময় সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন (প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গড্ডলিকা'র প্রকাশ **১৯২৪** খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর সমসাময়িক পূর্ব রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবে মাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৯ খ্রীঃ) সংঘটিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই শেষ

হয়েছে রুশ বিপ্লব (১৯১৭ খ্রীঃ), সেই সঙ্গে দেশীয় রাজনীতিতে ঘটে গেছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১ খ্রীঃ)-এর মত ঘটনা। একদিকে দেশীয় রাজনীতির টানাপোড়েন, উত্থানপতন, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ কবলিত ভারতবাসীর দারিদ্র্য, বেকারত্ব ভারতবর্ষকে এক গভীর সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। এই বিশেষ সময় ভারতবর্ষের পরিবারকেন্দ্রিক ব্যক্তিজীবনেও আঘাত হানে। জন্ম হয় এক বিশেষ শ্রেণীর। সেই শ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেনি, কিন্তু যুদ্ধোত্তর সমাজ ব্যাধির ভয়ানক থাবা থেকে ভারতবর্ষ নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। সমকালীন সমাজ জীবনের অন্তঃপ্রবাহী এই ব্যাধিকে পরশুরাম গভীরভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। যার ফলস্বরূপ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে (মাঘ ১৩২৯) পরশুরাম ছদ্মনাম নিয়ে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসুর আত্মপ্রকাশ। ''পৌরাণিক পরশুরাম যেমন শুধু ক্ষত্রিয়দের দিকেই একমাত্র দৃষ্টি ও দৃষ্টির শাসনকে কেন্দ্রস্থ করেছিলেন, বিশ শতকের পরশুরাম তেমনি রক্ত-দৃষ্টিকে স্থির রাখেন বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সমাজের, সমাজ-মানুষের, তার যাবতীয় অসঙ্গতি, ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে।''[১১]

এবারে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বাদ দিয়ে রাজশেখরের আবির্ভাবের সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তখন স্বমহিমায় বিরাজিত। পাঠক সমাজও আত্মস্থ করেছেন রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যকে। এর পাশাপাশি শরৎচন্দ্রীয় ভাবালুতায় পাঠকসমাজ তখন মুগ্ধ ও নজরুলের যৌবন বন্দনার গানে উদ্দীপিত। 'কল্লোল' পত্রিকা সেই সময় সাহিত্য জগতে বেশ সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু 'কল্লোল' পত্রিকাকে সেই সময় রাজশেখর বসু আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন না। অবশ্য পরশুরামের প্রথম আবির্ভাব 'কল্লোলে' সম্ভবও ছিল না। কারণ 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে । তাঁর আগেই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে গেছে। কিন্তু প্রথম লগ্নে না হোক পরবর্তীকালে তো 'কল্লোলে' প্রবেশ করতে পারতেন তিনি! তাও তিনি করেননি। কেননা কল্লোলে রবীন্দ্রবিরোধিতার নামে রবীন্দ্রবিমুখতা ও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

> ''বাস্তবতা' আর 'আধুনিকতাকে' মূল মন্ত্র করে কল্লোলীয়রা আসরে নামেন। সে বাস্তবতা বিদেশী শিক্ষার ফল। রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতা তা থেকে আলাদা জাতের। পরশুরাম কল্লোলীয় বাস্তবতার অনুষঙ্গী হলেন না, তিনি বৈজ্ঞানিকের বাস্তবতা নিয়ে সমাজ ও তার মানুষের ভিতরটা পোষ্টমর্টেমে বসলেন। ল্যাবরেটরির অ্যাসিড, এ্যালকালি আর মাইক্রসকোপ হ'ল তাঁর হাতিয়ার, পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট স্পেসিমেন

হল তাঁর দেখা সমাজ ও সমাজের ভিতরের যাবতীয় বিষয়। পরশুরামের গল্প তাঁর কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীর মতই এক নিরীক্ষাধর্মী কথাশিল্পের গবেষণাগার—যেখানে ছোট মানুষ, ছোট জীবন অনেক বড় মাপের ব্যঞ্জনায় বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিতেই পাঠকের সামনে আসে।''[১২]

পরশুরামের প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম 'গড্ডলিকা' (১৯২৪ খ্রীঃ)। পরশুরামের জনপ্রিয় ছোটগল্পগুলি যেমন 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'চিকিৎসা সংকট', 'মহাবিদ্যা', 'লম্বকর্ণ', 'ভূষন্ডীর মাঠে' প্রভৃতি এই গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'গড্ডলিকা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশের পর কবিবন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি পাঠান। রবীন্দ্রনাথ গল্পগুলি পড়ে নিজের বিস্ময় গোপন করতে পারেননি। তিনি প্রফুল্লচন্দ্রকেই একটি চিঠির মাধ্যমে জানান তাঁর বিস্ময়ের কথা :

''বইখানির নাম 'গড্ডলিকা প্রবাহ'। ভয় ছিল পাছে নামের সঙ্গে বইয়ের আত্মপরিচয়ের মিল থাকে, কেননা সাহিত্যে গড্ডলিকা প্রবাহের অন্ত নাই। কিন্তু সহসা ইহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল। চমক লাগিবার হেতু এই যে, এমন একখানি বই হাতে আসিলে মনে হয়, লেখকের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় থাকা উচিত ছিল। সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যদি দ্বারের কাছে দেখি একটা উইএর ঢিবি আশ্চর্য ঠেকে না, কিন্তু যদি দেখি মস্ত একটা বট গাছ তবে সেটাকে কি ঠাহরাইব ভাবিয়া উঠা যায় না। লেখক পরশুরাম ছদ্মনামের পিছনে গা ঢাকা দিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিলাম, চেনা লোক বলিয়া মনে হইল না, কেননা লেখাটার উপর কোন চেনা হাতের ছাপ পড়ে নাই। নূতন মানুষ বটে সন্দেহ নাই কিন্তু পাকা হাত। ...

লেখার দিক হইতে বইখানি আমার কাছে বিস্ময়কর। ইহাতে আরো বিস্ময়ের আছে, সে যতীন্দ্রকুমারের চিত্র। লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কী চমৎকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা রেখার ধারের সমান তালে চলে, কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নহে। চরিত্রগুলো ডাহিনে বামে এমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে তাহাদের আর পালাইবার ফাঁক নাই।''[১৩]

রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে রাজশেখর বসুর প্রশংসা নিঃসন্দেহে রাজশেখরের কাছে গর্বের বিষয়। এই চিঠির পরেও প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে কম করে আরো দুটি চিঠি আদান প্রদান হয়। যেখানে গল্পকার হিসেবে রাজশেখর বসুর উত্থানের ক্ষণটি পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিঠির প্রত্যুত্তরে প্রফুল্লচন্দ্র রায় লেখেন :

''সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্যসত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'গড্ডলিকা'র প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্য সম্রাট স্বয়ং তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পরপর বারো হাজার কপি যে বিক্রয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেদিন গ্রন্থকার পরশুরামকে আমি বলিলাম, এ-প্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাঁহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়, তিনি আমারই হাতের তৈয়ারী একজন রাসায়নিক এবং আমার নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ কার্যে অনেকদিন যাবৎ ব্যাপৃত। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেও একজন ''কেষ্ট-বিষ্টু''! সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন! আর-একটি কথা! আপনি তো এগারো-বারো বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতেছেন। শুনিয়াছি ঈশ্বর গুপ্ত তিন বৎসর বয়সেই পদ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং পোপ নাকি কিশোর বয়সেই বলিয়াছিলেন—

Father father mercy take
I shall no more verses make!

অনেকে বলিয়া থাকেন যে চল্লিশ বৎসরের পর নতুন ধরণের কিছু কেহ রচনা করিতে পারেন না; কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখিয়াছি নিউটন ৪৩।৪৪ বৎসর বয়সের পূর্বেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন; কিন্তু গ্যালিলিও সেই বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর যুগান্তরসংঘটনকারী আবিষ্কার করেন; আবার (Schumann) শুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরে জড়-বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে চমৎকৃত করেন। রিচার্ডসন (Father of English novelists) পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন এবং আমার যেন স্মরণ হইতেছে, যখন পঞ্চাশ বৎসরের কাছাকাছি তখন তিনি নভেল্ লিখিতে হাত দেন। আমাদের পরশুরামও প্রায় ৪৩-৪৪ বৎসর বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আসল কথা এই যে আপনাকে কি অনুরোধ করিব যে আর-একটি এমন তীব্র সমালোচনা করুন যে পরশুরামের হাত হইতে কুঠার খসিয়া পড়ে? এক সময় পড়িয়াছিলাম যে অনেক তত্ত্ব ও শক্তি গুহায় নিহিত থাকে; কিন্তু ভগবানের লীলা কে বুঝিবে, কাহাকে কখন গুপ্ত অবস্থা হইতে সুপ্রকাশ করিয়া তুলেন।''[১৪]

রবীন্দ্রনাথ প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে এই চিঠির উত্তর পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক জায়গায় লেখেন :

''যাইহোক আমি রস যাচায়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলেম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।''[১৫]

(৩)

রাজশেখর বসুর গল্পগুলিকে কালগতভাবে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম পর্ব, এরপর ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ—মাঝের এই দশটি বছর তিনি কোন গল্প রচনায় মনোনিবেশ করেননি। এ সময় তিনি কেন গল্প রচনা করলেন না সে কারণ নির্ণয় করা হয়তো দুঃসাধ্য তবু অনুমান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে অধ্যাপক ও সমালোচক বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন:

''হয়তো প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষিতে গল্পকারের যা বলার ছিল—সবই বলা হয়ে গেছে। আমরা মনে করি সম্ভবত তাই। সাহিত্যে একজন কৌতুকরসের স্রষ্টা আজীবন কৌতুকরসকে সম্বল করে সমান মর্যাদার সাহিত্য সৃষ্টিতে নিমজ্জিত থাকতে পারেন না। সেখানে পুনরক্তি এসে যেতেই পারে প্রসঙ্গ এবং প্রকরণ —উভয়তেই। পরশুরাম ছিলেন আত্মসচেতন শিল্পী—যে কোন কৌতুক রসস্রষ্টাকে তা হতেই হয়। তাই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে লেখনির দুর্বার গতি, তার স্তব্ধতা বুঝিবা আত্মসচেতন, আত্মসমালোচনা মুখর, সতর্ক এক স্রষ্টার সচেতন প্রয়াসই! হয়ত বা মনের অধিতলের স্থিরনির্দিষ্ট বাসনাও!''[১৬]

এরপর ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ ছোটগল্পের জগতে তাঁর প্রত্যাবর্তন। হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবক্ষয়ী সমাজ মানুষ ও জাতীয় রাজনীতির নানা টানাপোড়েন অবস্থা আবার তাঁকে ছোটগল্পের আঙ্গিনায় আকৃষ্ট করে তোলে। বীরেন্দ্র দত্ত রাজশেখরের দ্বিতীয়বার এই গল্পের ক্ষেত্রে প্রবেশ সম্বন্ধে বলেছেন :

''তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দানব কলকাতার আশেপাশে তার বীভৎস বলবান হাত-পায়ের সঞ্চালন করে চলেছে সশব্দে। সারা বাংলাদেশের ওপর যুদ্ধের অক্টোপাশের প্রত্যক্ষ আক্রমনের ছায়া। ল্যাবরেটরির দেয়ালেও তার ঘা পড়ে। নিবিষ্ট বৈজ্ঞানিক আবার লেখনী হাতে নেন কথা-শিল্পীর। যখন সমাজ ভয়ঙ্কর ভাবে ভাঙতে থাকে, দেশের সংহতি, জাতীয়তায় পড়ে আঘাত, যখন পচন-পতন অবক্ষয় সমাজ-মানুষকে পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দেয় নির্মমভাবে, তখন একজন যথার্থ শিল্পী-প্রাণ মানুষ

লেখনী নিস্তব্ধ করে রাখতে পারেন না। কর্মীর সচেতনতা থেকে শিল্পীর সচেতনতাই তখন বড় হয়ে ওঠে। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির বৈজ্ঞানিক কর্মী-পরিচালক রাজশেখর বসু পরশুরামের রক্ত-বস্ত্র গায়ে জড়িয়ে শিল্পীর সচেতনতায় আবার গল্পের জগতে চলে আসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই তাঁকে টেনে আনে যুদ্ধমুখর ও বিধ্বস্ত সমাজের প্রাঙ্গনে, অসহায় মানুষদের জনতার মধ্যে। আমৃত্যু, অর্থাৎ উনিশশ' উনষাট পর্যন্ত সে লেখনী আর বন্ধ হয়নি।''[১৭]

দ্বিতীয় পর্বে গল্প লিখতে এসে যে গল্পগুলি তিনি উপহার দেন বাংলা সাহিত্যকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'গামানুষ জাতির কথা', 'পরশ পাথর', 'ভীম গীতা', 'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ', 'ভরতের ঝুমঝুমি', 'অক্রুর সংবাদ', 'বদনচৌধুরির শোকসভা', 'রটন্তীকুমার', 'কৃষ্ণকলি', 'বরনারী বরণ', 'নীলতারা', 'জয়হরির জেব্রা', 'তিরি চৌধুরী', 'মাঙ্গলিক', 'আনন্দীবাঈ', 'চাঙ্গায়নী সুধা', 'ডম্বরু পন্ডিত', 'গগন-চটি', 'নবজাতক', 'চিঠিবাজী', 'চমৎকুমারী', 'কর্দমমেখলা', 'সাড়ে সাত লাখ', 'যশোমতী', 'জয়রাম-জয়ন্তী', 'জামাই ষষ্টি' প্রভৃতি। এই পর্বের গল্পগুলি 'গল্পকল্প' (১৯৫০), 'ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি গল্প'(১৯৫২), 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প'(১৯৫৩), 'নীলতারা ইত্যাদি গল্প' (১৯৫৬), 'আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প'(১৯৫৭), 'চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প'(১৯৫৮) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পরশুরামের গল্পগ্রন্থ ও গল্প :

গ্রন্থ (রচনাকাল)	**গল্প (রচনাকাল)**
গড্ডলিকা (১৯২৪)	শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড (১৯২২)
	চিকিৎসা সঙ্কট (১৯২৩)
	মহাবিদ্যা (১৯২২)
	লম্বকর্ণ (১৯২৪)
	ভূশন্ডীর মাঠে (১৯২৩)
কজ্জলী (১৯২৭)	বিরিঞ্চিবাবা
	জাবালি
	দক্ষিণ রায়
	স্বয়ম্বরা
	কচি-সংসদ
	উলট-পুরাণ
হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প (১৯৩৭)	হনুমানের স্বপ্ন (১৯৩০)
	পুনর্মিলন (১৯২৯)
	উপেক্ষিত (১৯২৯)
	উপেক্ষিতা (১৯২৯)

	গুরুবিদায় (১৯৩০)
	মহেশের মহাযাত্রা (১৯৩০)
	রাতারাতি (১৯২৯-৩০)
	প্রেমচক্র (১৯৩২)
	দশকরণের বাণপ্রস্থ (১৯৪২)
	তৃতীয় দ্যূতসভা (১৯৪৩)
	আমের পরিণাম (১৯৪২)
গল্পকল্প	গামানুষজাতির কথা (১৯৪২)
(১৯৫০)	অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা (১৯৪৮)
	রাজভোগ (১৯৪৮)
	পরশপাথর (১৯৪৮)
	রামরাজ্য (১৯৪৯)
	শোনাকথা (১৯৪৯)
	তিন বিধাতা (১৯৫০)
	সিদ্ধিনাথের প্রলাপ (১৯৫১)
	চিরঞ্জীব (১৯৫১)
	ভীমগীতা (১৯৫০)
ধুস্তরীমায়া ইত্যাদি গল্প	ধুস্তুরীমায়া (১৯৫০)
(১৯৫২)	রামধনের বৈরাগ্য (১৯৫১)
	রেবতীর পতিলাভ (১৯৫১)
	লক্ষ্মীরবাহন (১৯৫১)
	ভরতের ঝুমঝুমি (১৯৫১)
	অক্রুর সংবাদ (১৯৫২)
	বদন চৌধুরীর শোকসভা (১৯৫২)
	যদু ডাক্তারের পেশেন্ট (১৯৫২)
	রটন্তী কুমার (১৯৫২)
	অগস্ত্যদ্বার (১৯৫২)
	ষষ্ঠীর কৃপা (১৯৫২)
	গন্ধমাদন বৈঠক (১৯৫২)
কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প	কৃষ্ণকলি (১৯৫২)
(১৯৫৩)	জটাধর বকশী (১৯৫২)
	বরনারীবরণ (১৯৫৩)
	একগুঁয়ে বার্থা (১৯৫৩)
	পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী (১৯৫৩)
	নিকষিত হোম (১৯৫৩)
	বালখিল্যগণের উৎপত্তি (১৯৫৩)
	সরলাক্ষ হোম (১৯৫৩)
	আতার পায়েস (১৯৫৩)

	ভবতোষ ঠাকুর (১৯৫৩)
	আনন্দ মিস্ত্রী (১৯৫৪)
	নিরামিষাশী বাঘ (১৯৫২)
নীলতারা ইত্যাদি গল্প	নীলতারা (১৯৫৪)
(১৯৫৬)	তিলোত্তমা (১৯৫৪)
	জটাধরের বিপদ (১৯৫৪)
	তিরি চৌধুরী (১৯৫৪)
	শিবলাল (১৯৫৪)
	নীলকণ্ঠ (১৯৫৪)
	জয়হরির জেব্রা (১৯৫৫)
	শিবামুখী চিম্‌টে (১৯৫৫)
	দ্বান্দ্বিক কবিতা (১৯৫৫)
	ধনুমামার হাসি (১৯৫৫)
	মাঙ্গলিক (১৯৫৫)
	নিধিরামের নির্বন্ধ (১৯৫৪)
	স্মৃতিকথা (১৯৫৫)
চমৎকুমারী ইত্যাদি	চমৎকুমারী (১৯৫৮)
গল্প (১৯৫৯)	কর্দম মেখলা (১৯৫৮)
	মাৎস্যন্যায় (১৯৫৮)
	উৎকোচ তত্ত্ব (১৯৫৮)
	প্রাচীন কথা (১৯৫৮)
	উৎকণ্ঠা স্তম্ভ (১৯৫৮)
	দীনেশের ভাগ্য (১৯৫৮)
	ভূষণপাল (১৯৫৯)
	দাঁড়কাগ (১৯৫৯)
	গনৎকার (১৯৫৯)
	সাড়েসাত লাখ (১৯৫৯)
	যশোমতী (১৯৫৯)
	জয়রাম জয়ন্তী (১৯৫৯)
	গুপী সাহেব (১৯৫৯)
	গুলবুলিস্তান (১৯৫৯)
আনন্দীবাঈ ইত্যাদি	আনন্দীবাঈ (১৯৫৬)
গল্প (১৯৫৭)	চাঙ্গায়নী সুধা (১৯৫৬)
	বটেশ্বরের অবদান (১৯৫৬)
	নির্মোক নৃত্য (১৯৫৬)
	ডম্বরু পন্ডিত (১৯৫৩)
	দুই সিংহ (১৯৪৬)
	কামরূপিনী (১৯৫৬)

কাশীনাথের জন্মান্তর (১৯৫৬)
গগন-চটি (১৯৫৭)
অদল বদল (১৯৫৭)
রাজমহিষী (১৯৫৭)
নবজাতক (১৯৫৭)
চিঠিবাজি (১৯৫৭)
সত্যসন্ধ বিনায়ক (১৯৫৭)
যযাতির জরা (১৯৫৭)

(৪)

রাজশেখর বসু 'পরশুরাম' ছদ্মনামে আমাদের কাছে পরিচিত। তিনি কেন ছদ্মনাম নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন সমালোচকের মনে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথেরও এরকম মনে হয়েছিল :

> ''পিতৃদত্ত নামের উপর তর্ক চলে না কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যতা বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে। পরন্তু অস্ত্রটা রূপধ্বংসকারীর, তাহা রূপসৃষ্টিকারীর নহে। পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে লেখক বুঝি জখম করিবার কাজে প্রবৃত্ত। কথাটা একেবারে সত্য নহে।'' [১৮]

পৌরাণিক পরশুরাম আবির্ভূত হয়েছিলেন কুঠার হাতে, ক্ষত্রিয় নিধন করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। তাই আমাদেরও মনে হতে পারে রাজশেখর বুঝি পৌরাণিক পরশুরামের কুঠার হাতে নিয়ে মানুষ মারার মত কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সমালোচক বীরেন্দ্র দত্ত এ প্রসঙ্গের আলোচনায় জানিয়েছেন :

> ''পৌরাণিক পরশুরামের হাতে ছিল পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার উপযোগী অগ্নিময় ও খরদীপ্ত কুঠার, রাজশেখরের লেখনী কুঠারে এল বাস্তব সমাজকে তার সমস্ত রকম উৎকেন্দ্রিকতার ন্যয়নীতিভ্রষ্টতা ধরিয়ে দেওয়ার উপযোগী ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা ও তারই দীপ্তিতে ক্ষমাহীন নির্মমতা। বিস্ময় এখানেও, তিনি কিন্তু কোথাও বিশেষ ব্যক্তিকে ঘা মেরে জ্বালা ধরাতে লেখনীকে নির্দেশ দেননি, দিয়েছেন তিক্ততার ওপরে হাসির 'কোটিং'। পৌরাণিক পরশুরামের সেই দু'চোখের অগ্নিজ্বালার, সেই কণ্ঠের সেই সক্রোধ বিস্ফার সেখানে অনুপস্থিত।'' [১৯]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন :

> ''নামে পরশুরাম, কিন্তু মাতৃঘাতী কুঠার নেই, আছে জলদেবতার দেওয়া সোনার কুঠার। তাতে ভয়ের ভান আছে। কিন্তু ভয় নেই। বারতির ভেতর আছে তার অপূর্ব ঔজ্জ্বল্য-দীপ্তি আর দুর্মূল্যতায় তা চিরদিন সঞ্চয় করে রাখার মতো ঐশ্বর্য।''[২০]

রাজশেখরের রচনাগুলিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি—একটি সিরিয়াসধর্মী রচনা, অন্যটি লঘুধর্মী। সিরিয়াসধর্মী রচনাগুলি রাজশেখরের গভীর মনন ও চিন্তা থেকে উৎসারিত। যুক্তি বিচার এই সমস্ত লেখাগুলির প্রধান অবলম্বন। এখানে আমরা হাস্যরসিক রাজশেখরকে পাই না। আর দ্বিতীয় ধরণের লেখাগুলিতে পাই অন্য রাজশেখরকে। জীবনকে সহজ সরল স্বাভাবিকভাবে দেখেছেন তিনি এখানে। হাস্যরসের মোড়কে সমাজের দোষত্রুটিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন তিনি। আর এই ধরনের রচনাগুলিতেই তাকে অবলম্বন করতে হয়েছে পরশুরাম ছদ্মনাম। এই দুটি নামের স্বাতন্ত্র্যতা রাজশেখর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছেন।

বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসুর শ্রেষ্ঠ পরিচয় হাস্যরসিকরূপে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। শ্রীভূদেব চৌধুরী বলেছেন :

> ''বাংলা হাসির গল্পের ইতিহাসে পরশুরাম ছদ্মনামে রাজশেখর বসুর (১৮৮০-১৯৬০) আত্মপ্রকাশ এক নূতন যুগের সূচনা করেছে ; আর ঐ একটিমাত্র ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত গতিতে চলেছিল সেই ধারা।''[২১]

বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচকেরাও এ বিষয়ে একমত।

শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন : ''আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক।''[২২]

প্রমথনাথ বিশী রাজশেখর বসুকে হাস্যরসিক হিসেবে অভিহিত করে লিখেছেন :

> ''পুরাকালে পরশুরাম এসেছিলেন মানুষ মারতে, আমাদের কালে পরশুরামের সে রকম কোন মারাত্মক উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি মানুষকে হাসিয়ে গিয়েছেন। এই হাসির প্রকৃতি কি তা না হয় পরে বিচার করা যাবে, তবে আপাতত: নির্বিচারে বলা যায় যে পরশুরাম হাসির গল্প লিখে গিয়েছেন—সে সব গল্পে অন্যান্য উপাদান থাকলেও হাসিটাই মূল উপাদান।''[২৩]

ড. অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন :

''হাস্যরস সৃষ্টিতে পরশুরামের সমকক্ষ লেখক বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে আর কেহই নেই।''[২৪]

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

''পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু (জন্ম ১৬ই মার্চ, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ - মৃত্যু ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ) বর্তমান শতকের প্রথম পাদের শেষ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত ৩৫ বছর (১৯২২-১৯৫৭) যাবৎ রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক-উইট-হিউমার-স্যাটেয়ারধর্মী গল্প লিখেছেন।''[২৫]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :

''পরিমার্জিত কৌতুকে, চরিত্রচিত্রণ নৈপুণ্যে এবং বাগবৈদগ্ধে তিনি (পরশুরাম) একাধারে বাঙ্গালির জেরম কে জেরম এবং স্টিফেন লিকক।''[২৬]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর হাস্যরস সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন :

''রাজশেখরবাবুর হাস্যরসের মধ্যে একটা স্বত:উৎসারিত প্রাচুর্য ও অনাবিল বিশুদ্ধি আছে। তাঁহার রসিকতাপ্রবাহ বুদ্ধির বজ্রক্রীড়ায় ঘোলাটে হয় নাই, সূর্যকরোজ্জ্বল নির্ঝরের ন্যায় সহজ সাবলীল নৃত্যভঙ্গে হাসির ঝিকিমিকি ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া চলিয়াছে।''[২৭]

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

''হাস্যকৌতুককে ক্লাসিক পর্যায়ে তুলে ধরার গৌরব তাঁর (পরশুরাম) প্রাপ্য।''[২৮]

যে কোন হাস্যরসসাত্মক সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য সমাজ সমালোচনা বা সমাজের অসঙ্গতিগুলিকে মানুষের চোখে তুলে ধরা। তাই হাস্যরসিককে একজন সমাজ সমালোচক বলা যেতে পারে। সমাজ সমালোচনা বাদ দিয়ে নিছক হাস্যরস সৃষ্টি করে কখনোই মহৎ হাস্যরসের সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। হাস্যরসিক তার হাসির মধ্য দিয়ে নানা সামাজিক অসঙ্গতিকে, চারিত্রিক অসঙ্গতিকে পাঠকের দরবারে তুলে ধরেন। সবক্ষেত্রেই তার অভিপ্রায় থাকে সমাজ সংস্কার।

''সমাজ সংস্কার হাসির (নিছক কৌতুক হাস্য ছাড়াও) উদ্দেশ্য বলেই হাস্যরসিককে একটা মাপকাঠি ব্যবহার করতে হয়। সে মাপকাঠি Ethical হতে পারে, Intellectual হতে পারে, Social হতে পারে বা অন্য কোন রকমের হতে পারে।

একটি Norm বা আদর্শ লেখকের মনের মধ্যে থাকে, সমাজের যেখানে সেই আদর্শের চ্যুতি ঘটেছে সেখানে তিনি মাপকাঠিখানি বের করে এগিয়ে আসেন।''[২৯]

রাজশেখর বসুর প্রথম গল্পসংকলন গ্রন্থ 'গড্ডলিকা' ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। এই গল্পগ্রন্থটিতে মোট পাঁচটি গল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলি যথাক্রমে : 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'চিকিৎসা-সংকট', 'মহাবিদ্যা', 'লম্বকর্ণ' ও 'ভূশন্ডীর মাঠে'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

''বইখানির নাম 'গড্ডলিকা প্রবাহ'। ভয় ছিল পাছে নামের সঙ্গে বইয়ের আত্মপরিচয়ের মিল থাকে, কেননা সাহিত্যে গড্ডলিকা প্রবাহের অন্ত নাই। কিন্তু সহসা ইহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল। চমক লাগিবার হেতু এই যে, এমন একখানি বই হাতে আসিলে মনে হয় লেখকের সঙ্গে দীর্ঘকালের পরিচয় থাকা উচিত ছিল। সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যদি দ্বারের কাছে দেখি একটা উইয়ের ঢিবি আশ্চর্য ঠেকে না, কিন্তু যদি দেখি মস্ত একটা বট গাছ তবে সেটাকে কি ঠাওরাইব ভাবিয়া উঠা যায় না। লেখক পরশুরাম ছদ্মনামের পিছনে গা ঢাকা দিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলাম, চেনা লোক বলিয়া মনে হইল না, কেননা লেখাটার উপর কোন চেনা হাতের ছাপ পড়ে নাই। নূতন মানুষ বটে সন্দেহ নাই কিন্তু পাকা হাত।''[৩০]

'গড্ডলিকা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' পরশুরামের প্রথম গল্প। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি প্রকাশের পর পরশুরাম রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। এই গল্পটিতে ধরা পড়েছে পরশুরামের গভীর সমাজ বীক্ষণ। ফন্দীবাজ অসাধু ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ এবং তাদের তিরস্কার এ গল্পের মূল কথা। এ গ্রন্থের বাকি গল্পগুলি হল 'চিকিৎসা-সঙ্কট', 'মহাবিদ্যা', 'লম্বকর্ণ' ও ভূশন্ডীর মাঠে'। এ গল্পগুলিতে রয়েছে পরশুরামের গভীর সমাজ বীক্ষণের পরিচয়। এই গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলিতে কৌতুকের অন্তরালে পরশুরাম কোথাও ভন্ড চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করেছেন, কোথাও বা ব্যঙ্গ করেছেন সমাজের জ্ঞানিগুণী লোকের মুর্খামিকে। মানবপ্রীতি ও মমত্ববোধের হাসি ও অশ্রু—দুটি দিককেই লেখক এখানে আলোকপাত করেছেন অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে।

পরশুরামের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'কজ্জলী' (১৯২৮)। এই গ্রন্থটি ৬টি গল্পের সংকলন। গল্পগুলি হল—'বিরিঞ্চিবাবা', 'জাবালি', 'দক্ষিণ রায়', 'স্বয়ম্বরা', 'কচিসংসদ' ও 'উলট পুরাণ'। এই পর্বের গল্পগুলি বিচিত্র স্বাদের। গল্পগুলিতে ধরা পড়েছে পরশুরামের নিজস্ব মৌলিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণী। গল্পের মোড়কে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও সামাজিক

অসঙ্গতির প্রতি আলোকপাত করেছেন। হাসির আড়ালে এখানে বর্ষিত হয়েছে বিদ্রূপবাণ। পরশুরাম এখানে পৌরাণিক চরিত্রকেও আধুনিকতার মোড়কে উপস্থাপিত করেছেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ১১টি গল্পের সংকলন গ্রন্থ 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প'। পরশুরামের পরিণত মনের ছাপ ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলিতে। এই গ্রন্থে যে সমস্ত গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলি হল 'হনুমানের স্বপ্ন', 'পুনর্মিলন', 'উপেক্ষিত', 'উপেক্ষিতা', 'গুরুবিদায়', 'মহেশের যাত্রা', 'রাতারাতি', 'প্রেমচক্র', 'দশকরণের বাণপ্রস্থ', 'তৃতীয় দ্যূতসভা' ও 'আমের পরিণাম' প্রভৃতি। এই গল্পগুলি বিচিত্র স্বাদের। পরশুরাম যে ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্পকার তার নিদর্শন রয়েছে এই গল্পগুলিতে। কখনো তিনি বাস্তব সচেতন শিল্পী আবার কখনো গা-ছম-ছম করা অতিপ্রাকৃতরসের সংযোজনকারী শিল্পী। মানব চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি কৌতুকের মধ্য দিয়ে পরশুরাম তুলে ধরেছেন আলোচ্য গল্পগুলিতে। লেখকের নিবিড় সহানুভূতির স্পর্শে প্রতিটি গল্পেই ভাবের সঙ্গে ভাষার সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে উঠেছে।

এরপর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ১০টি গল্পের সংকলন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে পরশুরামের আরেকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ 'গল্পকল্প'। নামকরণটি শুনে মনে হতে পারে যে খুব সম্ভবত গল্পগুলি বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন, কিন্তু তা নয়। বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার মেলবন্ধনে গল্পগুলি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। এই গ্রন্থে যে গল্পগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলি হল : 'গামানুষ জাতির কথা', 'অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা', 'রাজভোগ', 'পরশপাথর', 'রামরাজ্য', 'শোনাকথা', 'তিন বিধাতা', 'ভীমগীতা', 'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ', 'চিরঞ্জীব' প্রভৃতি। রসাবেদনের ক্ষেত্রে প্রতিটি গল্পই ভিন্নতর। পরশুরামের নিজস্ব মৌলিক ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণী ধরা পরেছে এই গল্পগুলিতে। এখানে তিনি যেন হয়ে উঠেছেন জীবনরসিক শিল্পী। কাহিনি অনেকক্ষেত্রে ট্র্যাজেডি লক্ষ্মনাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তিনি যে অনুপম রস সৃষ্টিতে কুশলী শিল্পী তার দৃষ্টান্ত রয়েছে আলোচ্য গল্পগুলিতে। সেই সঙ্গে রয়েছে শিশু মনস্তত্বকে নিয়ে কৌতুক সৃষ্টির এক ভিন্নরকমের প্রচেষ্টা। প্রকাশ রীতির নূতন কলা-কৌশলে লেখকের শিল্পদৃষ্টির পরিচয়ও এখানে পাওয়া যায়।

এরপর ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় পরশুরামের আরেকটি গল্পগ্রন্থ 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প'। যে গল্পগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয় সেগুলি হল 'কৃষ্ণকলি', 'জটাধর বক্সী', 'নিরামিষাশী বাঘ', 'বরনারীবরণ', 'একগুয়ে বার্থা', 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী', 'নিকষিত হেম', 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি', 'সরলাক্ষ হোম', 'আতার পায়েস', 'ভবতোষ ঠাকুর', 'আনন্দ মিস্ত্রী' প্রভৃতি। অর্থাৎ মোট বারোটি গল্প এই গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত। এখানে লেখক বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন রেখেছেন। পুরাণ-নিষ্ঠার সাথে সাথে গল্পকার মানবমনের জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিকের

প্রতি আলোকপাত করেছেন আলোচ্য গল্পগুলিতে। সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে অতিলৌকিক গল্পরস সৃজনে পরশুরামের দক্ষতা।

'নীলতারা ইত্যাদি গল্প' গ্রন্থটি পরশুরামের এক অনবদ্য সৃষ্টি। গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই গ্রন্থের গল্প সংখ্যা মোট ১৩টি। এই গল্পগুলি হল—'নীলতারা', 'তিলোত্তমা', 'জটাধরের বিপদ', 'তিরিচৌধুরী', 'শিবলাল', 'নীলকণ্ঠ', 'জয়হরির জেব্রা', 'শিবামুখী চিমটে', 'দ্বান্দ্বিক কবিতা', 'ধনুমামার হাসি', 'মাঙ্গলিক', 'নিধিরামের নির্বন্ধ', 'স্মৃতিকথা' প্রভৃতি। এই পর্বের ছোটগল্পগুলিকে পরশুরাম কল্পনার রঙে রাঙিয়েছেন এবং সমাজ বাস্তবতার প্রসঙ্গও এগুলিতে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত।

পরশুরামের এর পরের গল্পগ্রন্থ 'আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। মোট ১৫টি গল্প এতে স্থান পেয়েছে। এই গল্পগুলি হল আনন্দীবাঈ', চাঙ্গায়নী সুধা', 'বটেশ্বরের অবদান', 'নির্মোক নৃত্য', 'ডম্বরু পন্ডিত', 'দুই সিংহ', 'কামরূপিনী', 'কাশীনাথের জন্মান্তর', 'গগন-চটি', 'অদলবদল', 'রাজমহিষী', 'নবজাতক', 'চিঠিবাজী', 'সত্যসন্ধ বিনায়ক', 'যযাতির যরা' প্রভৃতি। এই পর্বের প্রতিটি গল্পেই পরশুরামের নিজস্ব মৌলিক প্রতিভা ধরা পড়েছে। অনেকগুলি গল্পই কাল্পনিক উদ্ভট, আজগুবি শ্রেণীভুক্ত। স্থানে স্থানে যেমন কৌতুকরসের সংযোজন ঘটেছে তেমনি মানুষের নানা চারিত্রিক দুর্বলতার প্রতি পরশুরামের ব্যঙ্গলেখনী হয়েছে সোচ্চার। কোন কোন গল্পে লেখক বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনাশক্তির মিশ্রণে পরশুরামের এ গল্পগুলি অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

পরশুরামের শেষ গল্পগ্রন্থ 'চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প'। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থের গল্প সংখ্যা মোট ১৬টি। এই গল্পগুলির মধ্যে 'জামাই ষষ্ঠী' গল্পটি অসমাপ্ত অবস্থায় প্রকাশিত হয়। গল্পটির পেন্সিলে লেখা খসড়া পান্ডুলিপি রাজশেখরের মৃত্যুর পর পাওয়া যায়। লেখা অনেক আগের। এ গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত 'গুলবুলিস্থান' গল্পটি আরব্য উপন্যাসের উপসংহার। আরব্য উপন্যাস সম্পর্কে যে পরশুরামের কৌতূহল ছিল তার দৃষ্টান্ত 'গুলবুলিস্থান' গল্পটি। এ গ্রন্থে প্রকাশিত অন্যান্য গল্পগুলি হল 'চমৎকুমারী', 'কর্দম মেখলা', 'মাৎস ন্যায়', 'উৎকোচ তত্ত্ব', প্রাচীন কথা', 'উৎকণ্ঠা স্তম্ভ', 'দীনেশের ভাগ্য', 'ভূষণ পাল', 'দাঁড় কাগ', 'গণৎকার', 'সাড়েসাত লাখ', 'যশোমতী', 'জয়রাম জয়ন্তী', 'গুপি সাহেব' প্রভৃতি। গল্পগুলি বেশীরভাগই কৌতুক রসাত্মক। তবে কৌতুকের আড়ালে ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে এগুলিতে। কোথাও অতিরঞ্জন ও বুদ্ধিভ্রংশকারী অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। যদিও অনেকগুলি গল্প অনেকটা হাল্কা চালের, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গভীর উপলব্ধির

অভাব সেখানে থেকে গেছে, তা সত্ত্বেও এ গল্পগুলি থেকে রঙ্গব্যঙ্গপ্রিয় পরশুরামকে চিনে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না।

পরশুরামের গল্পগ্রন্থ সংখ্যা নয়টি। এই নয়টি গল্পগ্রন্থে পরশুরামের মোট ১০০টি গল্পের সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর বিচিত্রমুখী ছোটগল্পকে বিষয় অনুসারে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে:

পৌরাণিক প্রসঙ্গযুক্ত, ভন্ডামি বিষয়ক, রোমান্স-রসিকতাপূর্ণ, সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয়ক, আদর্শবাদের ব্যঙ্গচিত্র বিষয়ক, রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ক, কল্প বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ বিষয়ক, জড় পদার্থ বিষয়ক, পশু ও পাখী বিষয়ক, অতিপ্রাকৃত ও ভৌতিক বিষয়ক ও আজগুবি বিষয়ক। বিষয় অনুসারে গল্পগুলি নিম্নে প্রদত্ত হল :

(১) পৌরাণিক প্রসঙ্গযুক্ত গল্প : পুরাণকে আধুনিক কালের মধ্যে এনে তার নধ্যে অভিনব তাৎপর্যের সন্ধান করে পরশুরাম বহু ছোটগল্প রচনা করেছেন। পৌরাণিক ও আধুনিকতার সংমিশ্রণে গল্পগুলির মধ্যে কৌতুকরসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এই পর্বের গল্পগুলি হল : 'জাবালী', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'দশকরণের বাণপ্রস্থ', 'তৃতীয় দ্যূতসভা', 'রাম রাজ্য', 'ভীমগীতা', 'চিরঞ্জীব', 'ভরতের ঝুমঝুমি', 'রেবতীর পতিলাভ', 'গন্ধমাদন বৈঠক', 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী', 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি', 'নির্মোক নৃত্য', 'ডম্বরু পন্ডিত', 'যযাতির যরা', 'কর্দম মেখলা' প্রভৃতি।

(২) ভন্ডামি বিষয়ক গল্প : 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'বিরিঞ্চিবাবা, 'চিকিৎসা সঙ্কট, 'যদু ডাক্তারের পেশেন্ট' প্রভৃতি।

(৩) সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধাচরণ বিষয়ক গল্প : 'দুই সিংহ', 'রামধনের বৈরাগ্য', 'বটেশ্বরের অবদান', 'দ্বান্দ্বিক কবিতা' প্রভৃতি।

(৪) আদর্শবাদের ব্যঙ্গচিত্র বিষয়ক গল্প : 'অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা', 'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ', 'অক্রুর সংবাদ', 'ভবতোষ ঠাকুর', 'নিধিরামের নির্বন্ধ', 'সত্যসন্ধ বিনায়ক', 'ভূষন পাল' প্রভৃতি।

(৫) অতিপ্রাকৃত ও ভৌতিক গল্প : 'মহেশের মহাযাত্রা', 'ভূশন্ডীর মাঠে', 'বদন চৌধুরীর শোকসভা', 'জটাধর বক্সী', 'শিবামুখী চিমটে' প্রভৃতি।

(৬) রোমান্স-রসিকতাপূর্ণ গল্প : 'পুনর্মিলন, 'উপেক্ষিত', 'উপেক্ষিতা''প্রেমচক্র', 'নীলতারা', 'তিলোত্তমা', 'তিরি চৌধুরী', 'রাজমহিষী', 'চিঠিবাজী','যশোমতী', 'জয়হরির জেব্রা' প্রভৃতি।

(৭) শিশুচরিত্রপ্রধান গল্প : 'কৃষ্ণকলি', 'রটন্তী কুমার', 'শিবামুখী চিমটে', 'ধনুমামার হাসি' প্রভৃতি।

(৮) পশুপাখী বিষয়ক গল্প : 'লম্বকর্ণ', 'গুরু বিদায়', 'দক্ষিণরায়', 'লক্ষ্মীর বাহন', 'জয়হরির জেব্রা', 'রাজমহিষী', 'নবলাল' প্রভৃতি।

(৯) রাজনীতি বিষয়ক গল্প : 'দক্ষিণরায়', 'উলট পুরাণ', 'তিন বিধাতা' প্রভৃতি।

(১০) সমাজ-অর্থনীতি বিষয়ক গল্প : 'ষষ্ঠীর কৃপা' 'নীলকণ্ঠ', সিদ্ধিনাথের প্রলাপ', 'সাড়ে সাত লাখ' প্রভৃতি।

(১১) জড়পদার্থ বিষয়ক গল্প : 'একগুয়ে বার্থা' ও 'পরশপাথর'।

(১২) কল্প-বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গযুক্ত গল্প : 'গামানুষ জাতির কথা', 'গগনচটি', 'মাঙ্গলিক' প্রভৃতি।

(১৩) তারুণ্যের বিলাসিতা ও অসঙ্গতিমূলক গল্প : 'কচি সংসদ', 'রাতারাতি' প্রভৃতি।

এছাড়াও পরশুরামের ছোটগল্পগুলির আরো দুটি শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে :

(ক) কেদার চাটুয্যে পর্যায় : 'লম্বকর্ণ', 'গুরুবিদায়', 'রাতারাতি', 'স্বয়ংবরা', 'দক্ষিণ রায়', 'মহেশের মহাযাত্রা' প্রভৃতি।

(খ) জটাধর বক্সী পর্যায় : 'চাঙ্গায়ণী সুধা', 'মাঙ্গলিক', 'গ মানুষ জাতির কথা' প্রভৃতি।

(১) পৌরাণিক প্রসঙ্গযুক্ত গল্প :

পরশুরামের অনেকগুলি গল্প রয়েছে যেগুলি পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্রকে অবলম্বন করে রচিত। ভারতবর্ষের পৌরাণিক কাহিনির প্রতি রাজশেখরের গভীর অনুরাগ ছিল। সেই

অনুরাগবশতঃ বাল্মীকির 'রামায়ণ' ও ব্যাসদেবের 'মহাভারতে'র সংক্ষিপ্ত, তথ্যনিষ্ঠ গদ্য রূপান্তর করেছিলেন তিনি। সারানুবাদ করেছেন কালিদাসের 'মেঘদূত' ও 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতার'। পৌরাণিক জগতের অন্দরমহলে অবাধ যাতায়াতের সূত্রে পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে হাতের তালুর মতই চিনতে পেরেছিলেন পরশুরাম। তাই তিনি যখন ছোটগল্প লিখেছেন তখনও পৌরাণিক প্রসঙ্গ তাঁর মনে সদাজাগ্রত ছিল। রাজশেখর বসু জানতেন :

> ''পুরাণ কথার একটি মোহিনী শক্তি আছে। যদি নিপুণ রচয়িতার মুখ বা লেখনী থেকে নির্গত হয় তবে তা বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলকেই মুগ্ধ করতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তার ত্রুটি আমরা সহজেই মার্জনা করি। শিশু যেমন রূপকথার অবিশ্বাস্য ব্যাপার মেনে নিয়ে প্রাচীন সাহিত্য উপভোগ করতে পারে। এর জন্য ধর্ম বিশ্বস বা পূর্ব সংস্কার একান্ত আবশ্যক নয় তেমনি উদার পাঠক সর্বদেশের পুরাণই সমদৃষ্টিতে পাঠ করতে পারেন। বাল্মীকির গ্রন্থে রূপকথা ও আরব্য উপন্যাসের তুল্য বিচিত্র অতিপ্রাকৃত বর্ণনা অনেক আছে। সেখানে কাব্যরসও প্রচুর আছে কিন্তু এর আখ্যানভাগই সাধারণ পাঠকের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। বাল্মীকি কথিত এই প্রাচীন আখ্যান কোনও আধুনিক উপন্যাসের চেয়ে কম মনোহর নয়।''[৩১]

তাঁর পুরাণবিষয়ক গল্পগুলি সেই ভাবনারই ফসল। এ গল্পগুলি সমস্তই যে হাস্যরসের গল্প তা নয় তবে হাস্যরসিক রাজশেখরের ব্যক্তিত্বকে জানতে হলে এ গল্পগুলিরও আলোচনা করা প্রয়োজন।

পৌরাণিক বিষয়কে নিয়ে সাহিত্য রচনার প্রয়াস অবশ্য রাজশেখর বসুর আগেই শুরু হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে। সমগ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ডি. এল. রায় প্রমুখ সাহিত্যিকেরা পৌরাণিক চরিত্র ও বিষয় নিয়ে বহু গাথাকাব্য., মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য ও নাটক রচনা করেছিলেন। মধুসূদনের পুরাণপ্রীতি ও পৌরাণিক বিষয়ে জ্ঞান যে কত বিস্তৃত এবং গভীর ছিল তা তাঁর পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন। এক 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ পৌরাণিক অনুষঙ্গের কথা স্মরণ করলেই মধুসূদনের পৌরাণিক জ্ঞানের পরিধি আমাদের বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করে। কিন্তু পৌরাণিক বিষয় নিয়ে হাসির গল্প রচনায় সম্ভবত পরশুরামই পথিকৃৎ। তাঁর পৌরাণিক প্রসঙ্গযুক্ত গল্পগুলি আলোচনা করলেই এ বিষয়ে পরশুরামের গভীর বীক্ষণ ধরা পড়ে। এ গল্পগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় **'জাবালি'** গল্পের কথা।

পুরাণে জাবালির বিচিত্র সব পরিচয় আছে। জাবালি বিশ্বামিত্রের সন্তান এবং 'অথর্ব বেদে'র ব্যাখ্যাতা। 'ছান্দোগ্য উপনিষদ' থেকে জানা যায় জাবালা নামে এক রমণীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন জাবালি এবং তার গুরু গৌতম তাকে জাবালি নামে অভিহিত করেন। 'পদ্মপুরাণ' অনুসারে জাবালি একজন প্রভাবশালী মুণি ছিলেন এবং তাঁর সন্তানরা জাবালি নামে পরিচিত হতেন। 'স্কন্দ পুরাণে' বলা আছে জাবালি একজন মুণি যাঁর তপস্যায় ভয় পেয়ে ইন্দ্র রম্ভাকে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করতে পাঠায়। এতে তাঁর একটি কন্যা হয় এবং রাজা চিত্রাঙ্গদ তাকে চুরি করলে জাবালির শাপে চিত্রাঙ্গদ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। আবার অযোধ্যার রাজা দশরথের জাবালি নামে একজন যাজক ব্রাম্মণের কথা জানা যায়।

পরশুরাম যে জাবালির চরিত্র অঙ্কণ করেছেন তা বিশ শতকের উপযোগী। পুরাণের কাহিনিগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটি কাহিনি বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। জাবালির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পরশুরাম বিংশ শতাব্দীতে বসে এক নব জাবালির আখ্যান রচনা করেছেন। অবশ্য পুরাণ কাহিনিকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি। বিভিন্ন পুরাণ শাস্ত্রের মধ্যে তিনি রামায়নে বর্ণিত জাবালীর দ্বারাই সর্বাধিক প্রভাবিত হয়েছেন। পরশুরাম নিজেই জানিয়েছেন : ''জাবালীর কথা রামায়ণে এই পর্যন্ত আছে। যাহা নাই তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।''[৩২]

বলাবাহুল্য রামায়ণের এই না বলা কথাই পরশুরামের হাতে নব জাবালির উপাখ্যানে পরিনত হয়েছে। এই জাবালি আধুনিক মনস্ক। তাঁর ''ত্রি সন্ধ্যা নাই, জপতপ নাই, অগ্নিহোত্র নাই, কেবল তর্ক করিয়া লোক চটাইতে পারেন।''[৩৩] তিনি লোকায়ত দর্শনের অন্ধ অনুসারী নন, তিনি নির্ভিকচিত্ত সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত একজন বলিষ্ঠ পুরুষ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমসাময়িক ও তার পরবর্তী সময়ের সমাজ এবং মানুষকে পরশুরাম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমাজে তখনও নানা সংস্কার কীভাবে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে, কীভাবে মানুষ তাঁর নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে আদর্শ থেকে সরে আসছে এবং সত্য সুন্দরের চিরাচরিত আদর্শকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। জাবালি চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক সমাজের এই বাস্তব সত্যকেই উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন পরশুরাম।

'জাবালি' গল্পের কাহিনি অংশ সংক্ষিপ্ত। রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যানয়নের জন্য যারা চিত্রকূট পর্বতে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে জাবালি মুনিও ছিলেন। সকলেই যখন রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন তখন জাবালি রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে কিছু যুক্তির অবতারণা করেন। জাবালির যুক্তিগুলি রামচন্দ্রের মনে হয় ঘোর নাস্তিক্যবাদীর। জাবালি অযোধ্যায় ফিরে

এলে খর্বট, খল্লাট, খালিত প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁর প্রবল বিরোধিতা শুরু করেন। এমনকি বাড়িতে গিয়ে জাবালিকে অপমান করতেও ছাড়েন না। তখন নিঃসন্তান জাবালি স্ত্রী হিন্দোলিনীকে নিয়ে শতদ্রূ নদী তীরে এক রমণীয় উপত্যকায় পর্ণকুটির নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। এখানে জাবালির কাজ হল বিবিধ দুরূহ তত্ত্বসমূহের অনুসন্ধান করা এবং শতদ্রূ নদীতে মাছ ধরে অবসর সময় কাটানো। কিন্তু এখানেও নিস্তার নেই। গুজব রটে জাবালী ইন্দ্রত্ব, বিষ্ণুত্ব কিম্বা ঐরূপ কোন একটা পরমপদ আয়ত্ত করার জন্য তপস্যায় বসেছেন। ক্রমে এ খবর গিয়ে পৌঁছায় দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্র এতে ভয় পেয়ে জাবালির ধ্যান ভঙ্গের জন্য ঘৃতাচীকে তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু সে চেষ্টায় ঘৃতাচী ব্যর্থ হয়। এর পর নারদের কুটকৌশলে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা একত্রিত হয়ে জাবালিকে চরম দন্ড দেওয়ার জন্য 'বিশুদ্ধ চৈনিক হলাহল' জোর করে পান করায় এবং গভীর অরণ্যে ফেলে আসে। সেখানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় জাবালি এক স্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্নে তাঁর ভয়ঙ্কর নরক দর্শন ঘটলেও স্বপ্নভঙ্গের পর উপস্থিত হন স্বয়ং ব্রহ্মা। ব্রহ্মা তাকে বর দেন :

> ''হে স্বাবলম্বী মুক্তমতী যশোবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিও না, লোক সমাজে তোমার মন্ত্র প্রচার করো। তোমাকে কেহ বিনষ্ট করিবে না। অপরেও যেন তোমার দ্বারা বিনষ্ট না হয়। হে মহাত্বন, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে মানবমনকে সংসারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাক।''[৩৪]

গল্পটিতে অনায়াসে একটি রূপকের আবরণ আবিষ্কার করা যায়। একদিকে পরার্থমুখীনতা, অন্যদিকে প্রথাবিরুদ্ধতা এই দুইএর দ্বন্দ্বে মানবসমাজ যেন সুদূর অতীত থেকে আজও বিবর্তিত। সমাজের বাধাধরা গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসানো খুবই সহজ, সেখানে সঙ্গীরও অভাব হয় না। কিন্তু স্বাস্থ্যকর সমাজের জন্য মাঝে মধ্যেই প্রয়োজন পরে প্রথা ভাঙ্গার। এ কাজ অত্যন্ত কঠিন। পথে প্রতি পদে পদে আসে দুস্তর বাঁধা। তবু কাউকে না কাউকে অগ্রসর হতেই হয় এই পথে। জাবালি এরকমই একজন মুক্তমতি মানুষ যিনি কোনভাবেই সমাজের বাধাধরা গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসাননি। তাকে অপবাদ শুনতে হয়েছে নাস্তিক্যবাদীর, আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে বশিষ্ঠাদি মুনিদের। তাতেও দমে যাননি জাবালি। নির্ভিক কণ্ঠে সে বলেছে :

> ''রাম, আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছুই নাই তাহাও নহে। আমি সময় বুঝিয়া নাস্তিক হই, আবার অবসরক্রমে আস্তিক হইয়া থাকি। যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক, সেই কাল উপস্থিত। এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন করিবার নিমিত্ত এইরূপ কহিলাম, এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহা প্রত্যাহার করিতেছি।''[৩৫]

এরকম বাস্তব বুদ্ধির যুক্তিবাদী মানুষ সত্যিই বাংলা সাহিত্যে বোধহয় আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। জাবালি যেন আধুনিক অবক্ষয়িত মানবসমাজের বিরুদ্ধে একটি মূর্তিমান প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। তাই প্রমথনাথ বিশী এই চরিত্রটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন :

> ''পরশুরামের চোখে আদর্শ পুরুষ জাবালি। অমরনাথ ও কমলাকান্ত মিলিয়ে নিলে হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে খানিকটা পাওয়া যায়। তেমনি খুব সম্ভব পরশুরামের ব্যক্তিত্বের খানিকটা পাওয়া যায় জাবালি চরিত্রে। পরশুরামের Symbolic Hero জাবালি।''[৩৬]

যুক্তিবাদী বিধর্মী জাবালিকে শায়েস্তা করতে যে বালখিল্য মুণিরা পথে নেমেছিলেন সেই বালখিল্যদের উৎপত্তির ইতিহাস বিবৃত করা হয়েছে **'বালখিল্যগণের উৎপত্তি'** গল্পে। বালখিল্য মুণিরা বিদ্রোহের শ্লোগান বা আওয়াজ তুলতে তুলতে অকালে মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এরা 'অকাল কুষ্মান্ড' ও 'অকাল পক্ক'। এরা মাতৃদুগ্ধ পান করেনি, বাদুড়ের স্তনে পুষ্ট হয়ে ছিল। হঠকারিতা ছিল তাদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তারা ছিল চিরাচরিত সনাতন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। বালখিল্যগনের এরূপ বর্ণনার মধ্য দিয়ে পরশুরাম জাবালির মত সংস্কারপন্থী মানুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মানুষগুলির অন্তঃস্বরূপকে কটাক্ষ করেছেন। অনেকে গল্পটির মধ্যে তরুণ সমাজের প্রতি পরশুরামের কটাক্ষও খুঁজে পেয়েছেন। অজিত দত্ত এ গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন : ''বালখিল্যগণের উৎপত্তি' (কৃষ্ণকলি) গল্পটিতে তরুণ-সমাজের উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবকে তিনি যেরূপ তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন, এরূপ আর কোথাও দেখা যায়নি''।[৩৬]

'দশকরণের বাণপ্রস্থ' গল্পে একটি সুন্দর পৌরাণিক কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে। দর্ভাবতীর রাজা দশকরণ একদিন বাণপ্রস্থে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাণপ্রস্থে যাবার বয়স তাঁর হয়নি। তাই বৃদ্ধ মন্ত্রী, ধর্মজ্ঞ মান্ডুক তাকে বাধা দান করতে চাইলেন। কিন্তু দশরথ শুনলেন না। অবশেষে বাইশ বছর বয়সী পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে রাজ্য ত্যাগ করলেন তিনি। সঙ্গে নিলেন একটি নাতিবৃহৎ থলি। তারপর গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। দশকরণ একটি গাছের তলায় বসে একান্তঃকরণে ব্রহ্মার আরাধনা করতে লাগলেন। তিনদিন তিনরাত পরে তাকে ব্রহ্মা দর্শন দিলেন। ব্রহ্মা তাকে বর চাইতে বললে দশকরণ তাকে বললেন : ''আমার প্রত্যেক ইন্দ্রীয় দশগুণ করে দিন। অর্থাৎ বিংশতি চক্ষু, বিংশতি কর্ণ, দশ নাশা, দশ জিহ্বা, দশগুণ বিস্তৃত ত্বক।'' [৩৭] ব্রহ্মার বরে তিনি তাই পেলেন। এক বছর পর ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে আবার ব্রহ্মা এলেন। দশকরণ জানালেন যে তার অবস্থা খুব খারাপ। আর এই দশগুণ ইন্দ্রিয় নিয়ে সে মোটেই সুখী নয়। ব্রহ্মা তাকে আবার বর চাইতে বললেন। দশকরণ জানালেন :

''আমার একটা মনই গোলযোগের কারণ। এখন কৃপা করে দশটি মন দিন, তাতে প্রত্যঙ্গগুলি জট পাকাবে না, আলাদা আলাদা মনের খোপে থাকবে।''[৩৮] ব্রহ্মার বরে দশকরণ তাই পেলেন। আবার এক বৎসর পর দশকরণের ডাকে ব্রহ্মা হাজির। দশকরণ বললেন, ''দশটা মনে আরো গোলযোগ বেড়েছে। যতই চেষ্টা করি মনে হয় ভিন্ন ভিন্ন লোক ভোগ করছে।''[৩৯] তাই এবার দশকরণ তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে বললেন। তারও পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। দশকরণের কোন খবর ব্রহ্মা পান না। হঠাৎ ব্রহ্মার একদিন দশকরণকে মনে পড়ল। ব্রহ্মা দেখলেন যে দশকরণ নিতান্তই সাধারণ হয়ে গেছেন। পরিশ্রম করে, লোকের উপকার করে সে দিনাতিপাত করছে। দশকরণ সহাস্যে ব্রহ্মাকে জানালেন :

> ''এখন আমি দশকরণ নই কোটিকরণ; তারও একীকরণ হয়ে গেছে। গোছবাধা দশটা জীবের দরকার কি, দেখচি যত জীব আছে সবে মিলে আমি, এখন ভোগের ইয়ত্তা নেই। ভারী সুবিধা হয়েছে, সকলের সুখ-দুঃখ পৃথক করেও বুঝতে পারি, একত্রেও বুঝতে পারি।''[৪০]

এবারে দশকরণ ব্রহ্মার কাছে মুক্তির সন্ধান চাইলেন। ব্রহ্মা বললেন : ''আরে মুক্তির পথ কি একটা? তোমার রাজবুদ্ধি তোমাকে মুক্তির রাজমার্গ দেখিয়েছে।''[৪১]—এই বলে ব্রহ্মা অর্ন্তহিত হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'আমার মন' প্রবন্ধে যথার্থ সুখের স্বরূপ সন্ধান করেছিলেন। কমলাকান্তরূপী বঙ্কিম নানা স্থানে ঘুরে শেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ''পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই।'' 'দশকরণের বাণপ্রস্থ' গল্পেও রাজা দশরথ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পরোপকারই যথার্থ সুখ। তিনি এই সুখের সন্ধানে রাজসিংহাসন ছেড়ে বাণপ্রস্থে গমন করেছেন, ব্রম্মার বরে নিজের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে দশগুণ করে নিয়েছেন। কিন্তু কোথাও সুখের সন্ধান পাননি। অবশেষে পরের ঘর ছেয়ে দেওয়ার মধ্যেই তিনি প্রকৃত সুখের সন্ধান পেয়েছেন। সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ব্রম্মার কাছে তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি :

''খুব ভালো আছি প্রভু। এই গৃহের স্বামী অসুস্থ, অন্য পুরুষ নেই। বর্ষাও আসন্ন, তাই আমিই ঘরের চালটা মেরামত করে দিচ্ছি।''

'সুখ হচ্ছে ?'

পরিশ্রম হচ্ছে, অভ্যস নেই কিনা। সুখী হবে এই গোপ দম্পতি।'

'এখানেই থাকা হয় বুঝি?'

'না, গ্রামের প্রান্তে থাকি, তবে কাজের জন্য নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়।''[৪২]

'তৃতীয় দ্যূতসভা' গল্পে রাজনীতির অন্তরালে যে প্রতারণা লুকিয়ে থাকে তাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে একটি পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে। আধুনিক যুগের রাজনীতির কপটতাই এই গল্পের আলোচ্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই গল্পটি প্রসঙ্গে বলেছেন :

''বিংশ শতকীয় রাজনীতিই এই গল্পের আলোচ্য এবং সরলতা, সাধুতা ও ন্যায়নিষ্ঠা যে এ-যুগে একান্তভাবে নির্বোধের উপজীব্য, গল্পের দৃঢ়পিনদ্ধ সুতীক্ষ্ণ বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সে তত্ত্বটিই উপস্থিত করা হয়েছে।''[৪৩]

মহাভারতে উল্লিখিত কুরু-পান্ডবের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্যূতসভাকে এখানে বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন পরশুরাম। অবশ্য গল্পে যে দ্যূতসভার আয়োজন করা হয়েছে মহাভারতে তার উল্লেখ নেই। এই দ্যূতসভা পরশুরামের স্বকপোলকল্পিত। এই দ্যূতসভার আগে দু দুবার অনুষ্ঠিত পাশা খেলায় পান্ডব পক্ষ পরাজিত হলেও এবার কিন্তু ফলাফল উল্টো হল। পান্ডবপক্ষ জয় লাভ করলো। এই অসম্ভব সাধন সম্ভব হল শকুনির বৈমাত্রেয় ভাই মৎকুনির দ্বারা। মৎকুনি নির্মিত মন্ত্রশক্তিযুক্ত অক্ষের দ্বারা এর আগে শকুনি যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করেছে। কিন্তু এবার মৎকুনি আরও ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রশক্তিযুক্ত অক্ষ যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছে। এই অক্ষের সাহায্যে যুধিষ্ঠির খুব সহজেই শকুনিকে পরাজিত করেছে। কিন্তু শকুনি পরাজিত হওয়ার পর যা ঘটল তা বিপত্তি বাধাবার পক্ষে যথেষ্ট। সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন যুধিষ্ঠিরের পতিত পাশা ধীরে ধীরে লাফিয়ে লাফিয়ে শকুনির পাশার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তখন সভার সভাপতি বলরাম দুপক্ষেরই অক্ষ ভেঙ্গে দেখলেন। দেখা গেল শকুনির পাশা থেকে একটি ঘুরঘুরে পোকা বার হয়ে নির্জীবৎ হয়ে ধীরে ধীরে দাড়া নাড়তে লাগলো। আর যুধিষ্ঠিরকে জানালো, ''ধর্মরাজ, আপনার কুণ্ঠার কিছুমাত্র কারণ নেই, কূট পাশকের ব্যবহার দ্যূত বিধিসম্মত।''[৪৪] বর্তমান সময়ের রাজনীতি আরো অনেক বেশী প্রতারণাপূর্ণ বলেই পরশুরামের বিশ্বাস। তাই তার কটাক্ষযুক্ত মন্তব্য : ''বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে প্রতারণার যেসব উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে তার তুলনায় শকুনি-যুধিষ্ঠিরের পশাখেলা ছেলেখেলা মাত্র।''[৪৫]

'ভীমগীতা' গল্পের আকারে লিখিত প্রবন্ধ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ ও ভীমের কথোপকথন এই গল্পটির বিষয়। দুজনেই তাদের স্বীয় বক্তব্য তর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কৃষ্ণের দুই পরিচারক চোকমল্ল ও তোক্কমল্ল আড়িপেতে এই কথোপকথন শুনছিল। তারা নিতান্ত সাধারণ ও দুর্বল ব্যক্তি। তাদের সিদ্ধান্ত এই যে : ''দুর্বলের একমাত্র উপায় জোট বাঁধা। বোলতার ঝাঁক বাঘ সিংঘিকেও জব্দ করতে পারে।''[৪৬]

'ভরতের ঝুমঝুমি' গল্পে পৌরাণিক বিষয়কে আধুনিক তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মহামুণি দুর্বাসা। তবে যে দুর্বাসা পুরাণে মহাক্রোধী মুনি হিসেবে পরিচিত, যার অভিশাপের ভয়ে সকলেই সদা সন্ত্রস্ত থাকত আধুনিক কালে দুর্বাসার আর সেই তেজ নেই, সে নিজেই এখন অভিশপ্ত। তিনি মেনকাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তার (মেনকার) দেওয়া ঝুমঝুমিটি শকুন্তলার পুত্র ভরতকে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু সেই ঝুমঝুমিটি হারিয়ে যাওয়ায় দুর্বাসা তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। তারপর হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, কিন্তু সেই ঝুমঝুমিটি তিনি খুঁজে পাননি, প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করতে পারেননি। অবশেষে আধুনিক কালে বসে একটি বালক তাঁর পোষা ইঁদুর ছানা খুঁজতে গিয়ে দুর্বাসার দাঁড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার করল সেই ঝুমঝুমিটি :

> ''পুলিন দাঁড়ির নীচের ঝুঁটিটা একবার টিপে দেখলে, তারপর গেরো খুলতে লাগল। দুর্বাসা বললেন, আরে লাগে লাগে! কে তাঁর কথা শোনে, আমি তাঁর মাথাটি জোর করে ধরে রইলুম, পুলিন পড়পড় করে দাড়ি ছিড়ে ভিতর থেকে ঝুমঝুমি বার করলে। সোনার কি রূপোর কি টিনের বোঝা গেলো না, ময়লায় কালো হয়ে গেছে, কিন্তু বাজছে ঠিক।''[৪৭]

—এই কাহিনিসূত্রেই অত্যন্ত কৌশলে পরশুরাম বর্তমান সময়ের রাজনীতিবিদ, দেশভাগের সমস্যা প্রভৃতিকে কটাক্ষ করেছেন। এখন সকলেই চায় মন্ত্রী হতে কারণ সকলেই জানে একবার মন্ত্রী হলে সারাজীবনের ভাবনা আর তাকে ভাবতে হবে না। এই সহজ সত্যটি কারো কাছে আর অজানা নয়। তাই দুর্বাসা পুলিনকে রাজা হওয়ার আশীর্বাদ দিতে চাইলে পল্টু তার হয়ে বলেছে:

> ''ও আশীর্বাদ আর ফলবার উপায় নেই প্রভু, রাজাটাজা লোপ পেয়েছে। বরং এই আশীর্বাদ করুন যেন ও মন্ত্রী হতে পারে, অন্তত পাঁচ বছরের জন্য।''[৪৮]

পরশুরাম গল্পটি রচনা করেছেন ১৯৫১ খ্রীঃ। অর্থাৎ ভারত বিভাগ তখন হয়ে গেছে। জন্ম নিয়েছে দুটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্থান। এই ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা সুকৌশলে যেভাবে দুটি দেশকে চরম রাজনৈতিক সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে পরশুরাম তারও স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন এ গল্পে একটি সংলাপের মধ্য দিয়ে :

> ''ভরতের রাজ্য এখন দুভাগ হয়েছে, বড়টি ভারতীয় গণরাজ্য, ছোটটি ইসলামীয় পাকিস্থান।
>
> —একজন চক্রবর্তী রাজা আছেন তো ?

—এখন আর নেই, দুই রাজ্যে দুই রাষ্ট্রপতি বহাল হয়েছেন, একজন দিল্লীতে আর একজন করাচীতে থাকেন। আইন অনুসারে এরাই ভরতের স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং ঝুমঝুমিটি এঁদেরই হক পাওনা। কিন্তু দেবেন কাকে? একজনকে দিলে আরেকজন ইউ.এন.ও-তে নালিশ করবেন, না হয় ঘুষি বাগিয়ে বলবেন, লড়কে লেংগে ঝুমঝুমা। দুর্বাসা ক্ষণকাল ধ্যান মগ্ন হয়ে রইলেন। তারপর মট করে ঝুমঝুমিটি ভেঙ্গে বললেন, একজনকে দেব এই খোলটা যাতে পাথর কুচি আছে, নাড়লে কড়রমড়র করে। আর একজনকে দেব এই ডাঁটিটা, ফুঁ দিলে পিঁ পিঁ করে।''[৪৯]

সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এ গল্পের আরেকটি রূপক ব্যঞ্জনার কথা বলেছেন তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ :

''যুগ যুগ পরে দুর্বাসা যখন মীমাংসায় পহুঁছিলেন তখন ভরত বহুদিন বিগত হইয়াছেন এবং ন্যায় বিচার করিতে যাইয়া তাঁহাকে খেলনাটিকেই ভাঙ্গিতে হইল, ঝুমঝুমি আর ঝুমঝুম করিবে না। ইংরেজরাজ ভারতবর্ষ দ্বিখন্ডিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার আইন-সম্ভার যাহা বিপুল, ব্যাপক জটিল এবং কালক্ষয়ী। এই আইনের দলিল দস্তাবেজ নজিরের প্রাবল্যে এবং আইন ব্যবসায়ীদের কৌশলে মামলা আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু যখন তাহার নিস্পত্তি হয়, যদি কখনও নিস্পত্তি হয়ই, তখন দেখা যায় বাদী ও বিবাদীরা বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং যে সম্পত্তি লইয়া মামলা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারের ফলে মেনকা প্রদত্ত ঝুমঝুমির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।''[৫০]

'যযাতির যরা' গল্পে বৈরাগ্য সাধনের ভন্ডামিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। পুরাণ কাহিনি থেকে জানা যায় যে রাজা যযাতির প্রথমা পত্নী ছিলেন দেবযানী, শুক্রাচার্যের কন্যা। যযাতির তিন পুত্র, পুরু কনিষ্ঠ। শর্মিষ্ঠাকে যযাতি লুকিয়ে বিবাহ করেছিলেন, তা জানতে পেরে দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পিতার আশ্রমে চলে যান। শুক্রাচার্যের শাপে যযাতি অকালেই ষাট বৎসরের বৃদ্ধের তুল্য জরাগ্রস্থ হয়ে নারী সম্ভোগে অক্ষম হয়ে ছিলেন। ঘটনাচক্রে পুত্র পুরু পিতাকে তাঁর বিশ বছরের যৌবন প্রদান করে পিতার ষাট বছরের জরা গ্রহণ করেছিলেন।

পরশুরামের গল্পের কাহিনি আরম্ভ হয়েছে উক্ত ঘটনার পঁচিশ বছর পরে। ইতিমধ্যে পিতা পুত্র উভয়েরই বয়স পঁচিশ বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পঁচিশ বছরে রাজা যযাতি ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশটি বিবাহ করে নিজের যৌবনকে কানায় কানায় সম্পূর্ণ করে নিয়েছেন। কিন্তু নিজের যৌবন

ও পুত্রের যৌবন পর পর ভোগ করে তাঁর যৌবনে অতৃপ্তি এসে গেছে। তাই পুত্রের কাছ থেকে নিজের জরা ফিরিয়ে নিয়ে পুত্রকে তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দিতে চান এবং সংসার ত্যাগ করে বনগমনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু জরাগ্রস্থ হবার পর থেকে পুরু এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর শাস্ত্রপাঠ, যোগচর্চা আর আধ্যাত্ম চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন, বিবাহও করেননি। তাই এখন আর তিনি পিতার কাছ থেকে যৌবন ফিরে পেতে চান না। এদিকে যযাতিও তার জরা ফিরে পেতে মরিয়া। তাই তিনি পুত্রের পরামর্শ মত বার্ধক্যের সঙ্গে যৌবন বিনিময়ের জন্য তাঁর সংকল্প রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করে দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে প্রায় একহাজার জরাগ্রস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হাজির হলেন। তাদের কেউ বিকলাঙ্গ, কেউ অন্ধ বা রোগগ্রস্থ। যযাতি জরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত কিন্তু পঙ্গুত্ব বা অন্ধত্ব গ্রহণ করতে রাজী নন। তাই সমস্যার সমাধান হল না। এমন সময় দুই বৃদ্ধ এক অসামান্যা রূপসীর হাত ধরে এগিয়ে এলেন। সেই রূপসীর নাম মনোহরা। দুজন বৃদ্ধই মনোহরার পাণিপ্রার্থী। দুজনেই চান রাজার যৌবন ফিরে পেয়ে তাকে বিবাহ করতে। এই রূপযৌবনবতীকে দেখে রাজাও তাঁর সংকল্প ভুলে গেলেন। আবার তাঁর যৌবন জেগে উঠল। তিনি নিজেই সুন্দরীকে বিবাহ করতে চাইলেন। সমবেত প্রবীণেরা হৈ হৈ করে উঠলেন এবং রাজাকে অভিশাপের ভয় দেখালেন। সমস্যা সমাধানের জন্য তখন পুরুর ডাক পড়ল। মনোহরাকে দেখে এবং তার সঙ্গে আলাপ করে পুরু তাঁর পঁচিশ বছরের মোক্ষলাভের সাধনা অনায়াসে বিসর্জন দিয়ে নিজেই মনোহরার পাণিপ্রার্থী হয়ে বসলেন এবং যযাতির থেকে নিজের যৌবন ফিরিয়ে নিলেন। যযাতি বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন :

> ''ছি ছি ছি, এই যদি করবি তবে সেদিন অমন তেজ দেখিয়ে আমার কথায় না বললি কেন? এত লোকের সামনে ধাষ্টামো করবার কি দরকার ছিল?''[৫১]

'ভরতের ঝুমঝুমি' গল্পে পরশুরাম যেমন মহামুনি দুর্বাসাকে হাসির খোরাক করে তুলেছেন তেমনি ঋষি বিশ্বামিত্রকে হাসির খোরাক করে তুলেছেন তিনি **'কর্দম মেখলা'** গল্পে। পরশুরামের উদ্দেশ্য অবশ্যই আধুনিক মানুষ। ঋষি বিশ্বামিত্র চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে পরশুরাম অসংযমী চরিত্রভ্রষ্ট আধুনিক মানুষের প্রতি তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

পৌরাণিক ঋষি বিশ্বামিত্রকে পরশুরাম চূড়ান্ত অসংযমী চরিত্র রূপে অঙ্কণ করেছেন যিনি সংযম হারিয়ে তপস্যায় জলাঞ্জলী দিয়ে মেনকার মোহিনী মায়ায় ধরা দিয়েছেন। এবং কিছুদিন যেতে না যেতেই গর্ভবতী মেনকাকে তাড়িয়ে দেন এই বলে : ''পাপিষ্ঠা দূর হও এখান থেকে। তোমার গর্ভস্থ পাপও দূর হয়ে যাক।''[৫২] নিজের সন্তানের আর খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজন মনে না করে তিনি পুনর্বার তপস্যায় নিরত হলেন। এরপর কণ্বমুণির আশ্রমে কন্যা শকুন্তলাকে

দেখে আবার স্বধর্মচ্যুত হয়ে কন্যা স্নেহ বিগলিত হয়ে ঝড়ে পড়ল। এবং অবিবেচকের মত শকুন্তলার পালয়িত্রী দেবী গৌতমীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে গৌতমীর দ্বারা ভর্ৎসিত হলেন।

'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পের বিষয় হনুমানের বিবাহ প্রসঙ্গ। রামায়ণে বা প্রাচীন পুরাণে হনুমানের নানা কাহিনি থাকলেও তার বিবাহ প্রসঙ্গ কোথাও নেই। পরশুরাম আলোচ্য গল্পে হনুমানের বিবাহ প্রসঙ্গ বর্ণনা করে পুরাণের নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন। হনুমান চরিত্রে আদ্যন্ত পুরাণের বৈশিষ্ট্য ও মেজাজ বজায় রেখে লেখক একালের প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ মানুষের বিবাহ বাসনার প্রতি তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমজনিত সম্পর্কের জটিলতা এবং একজন পুরুষের পক্ষে এক বা একাধিক পত্নীর পাণিগ্রহণ সমস্যা ও সংকটের বাস্তব চিত্র। সমগ্র বিষয়টিকেই পরশুরাম অত্যন্ত সরসভাবে পরিবেশন করেছেন এ গল্পে।

'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হনুমান। রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হলে হনুমানকেও সেখানে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে তার মধ্যে ভাবান্তর ঘটে। অনেক চিকিৎসা, অনেক যজ্ঞের পরেও তার ভাবান্তর বদলায় না। একদিন সীতার কাছে সে তার ভাবান্তরের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে যে স্বপ্নে পূর্বপুরুষদের অনন্ত ক্ষুধাভাব দেখে সে অত্যন্ত চিন্তিত। যেহেতু সে নিজে অবিবাহিত এবং অপুত্রক তাই তার মৃত্যুর পরে পূর্বপুরুষদের পিন্ডদানের ব্যাপারে সে আরো চিন্তিত হয়ে পরে। তখন সীতার মুক্তিতে সে এই বয়সে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর হনুমান পরমাসুন্দরী এক বানরীর পাণি গ্রহণ করবার জন্য কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করে।

কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রার পথে এক অপরাহ্নে অনেক গিরি, নদী, জলাভূমি অতিক্রম করে হনুমান পৌঁছায় দন্ডকারণ্যে। সেখানে সে তুম্বদেশের অধিপতি চন্ডরীকের কাছে আশ্রয় নেয়। চন্ডরীক স্ত্রীর সঙ্গে কলহে বনে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছে। চন্ডরীকের কাছ থেকে সে জানতে পারে যে ''এক ভার্যা অশেষ অনর্থের মূল।''[৫৩] এরপরে তার সঙ্গে দেখা হয় গৃহত্যাগী লোমশ মুণির। লোমশ মুণির একশ পত্নী। কিন্তু তিনি গৃহে ফিরতে অনিচ্ছুক কারণ তার একশ স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে সর্বদা কলহ করে। দুজনের কাছে দুরকম অভিজ্ঞতা লাভ করে সেই রাতেই হনুমান কিষ্কিন্ধ্যায় চলে আসে। সেখানে সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা হলে সুগ্রীব জানায় যে সে নিজে খুবই সুখী তাঁর অষ্টোত্তর সহস্র ভার্যাদের নিয়ে। তারা সুগ্রীবকে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে না, কারণ সুগ্রীব তাদের প্রত্যেকের মুখে কদলীবল্কল দিয়ে ঠোঁট বেঁধে রাখে। শুধু প্রেমালাপের সময় তা খুলে দেয়। সুগ্রীব প্রথমে হনুমানকে প্রস্তাব দেয় তার সর্বাপেক্ষা প্রবীণা স্ত্রী অত্যন্ত সেবাপরায়ণ শ্রীমতী তারাদেবীকে বিবাহ করতে। তাকে সুগ্রীবের প্রয়োজন নেই আর বৃদ্ধ হনুমানের সঙ্গে

তাকে মানাবেও ভালো। হনুমান তারাদেবীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় হিসেবে মনে করে বলে সুগ্রীবের প্রস্তাব সে নাকচ করে দেয়। তখন সুগ্রীব তাকে কিষ্কিন্ধ প্রদেশের স্বর্গত অধিপতি প্লবংগমের দুহিতা, রাজ্যশাসনে অভিজ্ঞা, লাবণ্যময়ী, বিদূষী ও চতুরা একমাত্র দুহিতা, বানরী চিলিম্পার কাছে যেতে বলে। এক সময়ে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে সুগ্রীবের আঙ্গুলের কিছু অংশ তার কাছে হারাতে হয় বলে এই বানরীর উপর তার লোভ ও আক্রোশ দুইই বর্তমান। সুগ্রীবের পরামর্শ মত হনুমান চিলিম্পাকে প্রেম নিবেদন করলে চিলিম্পা হনুমানকে নানা প্রশ্ন করে প্রেমিক হিসেবে, স্বামী হিসেবে নানা পরীক্ষা করে। শেষে চিলিম্পা তাকে অপমান করতে চাইলে হনুমান প্রভঞ্জনকে স্মরণ করে চিলিম্পার চুল ধরে আকাশের দিকে লাফ দেয়। চিলিম্পাকে কিষ্কিন্ধ্যায় ছেড়ে দিয়ে হনুমান একাকী অযোধ্যায় প্রবেশ করে। এবং সীতার কাছে বর প্রার্থনা করে যাতে সে সীতা ও রামের প্রতি ভক্তি বিনম্র চিত্তে অমর হয়ে পূর্ব পুরুষদের জন্য চিরকালের জন্য পিতৃগণের পিন্ডোদক বিধান করতে পারে। চিলিম্পার কেশ ধরে আকাশে ওড়ার সময় হনুমানের সঙ্গে চিলিম্পার সংলাপ বিনিময় অংশটুকু এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

''চিলিম্পা কাতর কণ্ঠে কহিলেন—'হে মহাবীর, আমার কেশ ছাড়িয়া দাও, বড়ই লাগিতেছে। বরং আমাকে পৃষ্ঠে লও নতুবা বক্ষে ধারণ কর।'

হনুমান বলিলেন—'চোপ'!

চিলিম্পা বলিলেন—'হে প্রাণবল্লভ, আমি একান্ত তোমারই।

হে অরসিক, তুমি কি পরিহাস বুঝিতে পার নাই? আমি যে তোমা বই আর কাহাকেও জানি না।'

হনুমান পুনরপি বলিলেন—'চোপ''[৫৪]

—মহাবীর হনুমান বানরী চিলিম্পাকে হরণ করেছে ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে সংসার করতে ভয় পেয়েছে। কারণ সে জানে তার বীরত্ব সংসারের ক্ষেত্রে একেবারেই কোন কাজে লাগবে না। অবশেষে অমরত্বলাভ করার মধ্যেই হনুমান তার সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে।

এছাড়া পরশুরামের আরও কয়েকটি গল্প আছে যেখানে পুরাণের অনুষঙ্গ এসেছে। এই গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য **'তিন বিধাতা', 'গন্ধমাদন বৈঠক'**, **'পঞ্চপ্রীয়া পাঞ্চালী'**, **'রেবতীর পতীলাভ'**, **'স্মৃতিকথা'**, **'নির্মোকনৃত্য'** ইত্যাদি গল্প। এ গল্পগুলির মূল বিষয়ের সঙ্গে হাস্যরসের কোন সম্পর্ক নেই। তবে মাঝে মাঝে সংলাপ ও চরিত্রের অসঙ্গতিমূলক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এই গল্পগুলি সরস হয়ে উঠেছে।

(২) ভন্ডামি বিষয়ক গল্প :

রঙ্গব্যঙ্গের শিল্পী হিসেবে রাজশেখরের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সমালোচনা। হাসির মালা গাঁথতে গাঁথতে সমাজের নানা অসঙ্গতিগুলিকে তিনি কটাক্ষবাণে বিদ্ধ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক হয়েছে জীবনের নানা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছিলেন :

'কত ভঙ্গ এ বঙ্গ তবু রঙ্গে ভরা'

বঙ্গের এই রঙ্গকে রাজশেখর যথার্থ আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। তাই ভন্ড চিকিৎসা ব্যবসায়ী, আইন ব্যবসায়ী, ধর্ম ব্যবসায়ী তাঁর গল্পে খুব সহজভাবেই স্থান লাভ করেছে। চোরাকারবার, জোচ্চুরি, দুর্নীতি, বাঙ্গালী চরিত্রের শূন্যগর্ভ আস্ফালন প্রভৃতি বিষয়গুলিকে তিনি গল্পের বিষয়ীভূত করেছেন। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি ছিল বক্র। রাজশেখর বসুর প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ খ্রীঃ। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। তখন কলকাতার শেয়ার বাজার খুব জমজমাট। ইতিহাসের তথ্য অনুসারে শেয়ার বাজার ইংরেজেরই সৃষ্টি। এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হবার কিছুদিনের মধ্যেই শেয়ার বাজার গড়ে উঠে। শেয়ার বাজার এমন একটি জায়গা যেখানে বিনা পরিশ্রমে অল্পদিনের মধ্যে অধিক লাভের সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য ক্ষতিরও সম্ভাবনা সমূহ। শেয়ার বাজারে প্রচুর টাকা পয়সা ক্ষতি করে সর্বশান্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত সমাজে প্রচুর পাওয়া যায়। এই শেয়ার ব্যবসার নামে চলে অসাধু ব্যবসার কারবারও। আর এটা তো আরও ভয়ংকর। রাজশেখর বসু 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে শেয়ার ব্যবসার অন্তরালে যে অসাধু জুয়াচুরী কারবার চলে তার উপর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন ধর্মের নামে ভন্ডামিকে।

'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের নায়ক শ্রী শ্যামানন্দ ব্রম্মচারী। তিনি নানারকম কারবার করেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। তাই সম্প্রতি ব্রম্মচারী-অ্যান্ড-ব্রাদার-ইন-ল নামে একটি আপিস প্রতিষ্ঠা করেছেন। উদ্দেশ্য 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' কোম্পানীর নামে বাজারে প্রচুর শেয়ার ছাড়া এবং শেয়ার হোল্ডার যোগার করা। শ্যামবাবু ভারতবর্ষের বিখ্যাত দেব মন্দিরগুলির বিপুল আয় সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন। তাই খুব সহজেই শ্রীসিদ্ধেশ্বরী দেবীর নামে মন্দির নির্মাণ করা যাবে বলে তিনি সকলকে বোঝাতে সক্ষম হলেন। তাঁর হিসেব অনুযায়ী :

> ''বঙ্গদেশের একটি দেব মন্দিরের দৈনিক যাত্রিসংখ্যা গড়ে ১৫ হাজার। যদি লোকপিছু চারআনা মাত্র আয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাৎসরিক আয় প্রায় সাড়ে তের লক্ষ টাকা দাঁড়ায়।''[৫৫]

এই বিপুল আয়ের অংশিদারী হতে তার সংগে হাত মেলালেন অটল, গন্ডেরিরাম বাটপেরিয়ার মত সমাজের ধূর্ত ব্যবসায়ীরা। তিনকড়িবাবুর মত রিটায়ার্ড ডেপুটিকেও নানা লোভ দেখিয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করলেন। কিছুদিনের মধ্যে বিজ্ঞাপনের জোরে এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের চেষ্টায় সমস্ত শেয়ারই বিলি হয়ে গেল। শেয়ারের চাহিদা এতটাই যে লোকে বাজার থেকে চড়া দামে শেয়ার কিনতে থাকে। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই কোম্পানীতে বড় অঙ্কের একটা টাকা জমা পড়ে। কোম্পানীর প্রধান শ্যামবাবুও অচিরেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে। প্রচুর টাকা সে কামিয়ে নেয়। এবং সবশেষে তিনকড়িবাবুকে কোম্পানী চালাবার ভার অর্পণ করে শ্যামবাবু সরে পড়ে এবং কোম্পানী ডুবে যায়।

'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল বইখানি 'চরিত্র চিত্রশালা'। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে গল্পটির মূল আকর্ষণ এ গল্পের চরিত্রগুলি। শঠ শ্যামানন্দ ব্রম্মচারীর শ্যালক বিপিন, সদ্যোজাত অ্যাটর্ণী অটলবাবু, অর্থলোভী অথচ কৃপণ রিটায়ার ডেপুটি রায়সাহেব তিনকড়ি বাড়ুজ্যে এ গল্পের কাহিনিকে রূপ দিয়েছেন। চরিত্রগুলি শঠতা এবং ধূর্তামীতে যেন একে অপরকে ছাড়িয়ে গেছে। শ্যামানন্দর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁর গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, আকণ্ঠ লম্বিত কেশ তাঁর চেহারাকে একটি বিশেষ মাত্রা দান করেছে। তাঁর অর্থলোভ সীমাহীন। এই অর্থলোভ চরিতার্থ করতে তিনি আশ্রয় নেন ধাপ্পাবাজীর। এ ক্ষেত্রে তাঁর সহায় হয় ধর্ম। ধর্মকে ভিত্তি করেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এর মত লোক ঠকানো প্রতিষ্ঠান। কোম্পানীর অভিনব প্রসপেক্টাস তৈরী করে, স্ত্রীকে নিজের সম্পত্তি দান করে, শেয়ার বিক্রির টাকায় মন্দির ইত্যাদি তৈরী করার পরিকল্পনা ফাঁদেন তিনি। এরপর সমস্ত টাকা গোপনে সরিয়ে কোম্পানীকে দেউলিয়া করে, শেষে কথার মারপ্যাঁচে ডুবে যাওয়া কোম্পানীকে অন্যের উপর চাপিয়ে তিনি সরে পড়েন।

শ্যামানন্দ চরিত্রটি পরশুরামের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। তাঁর কাজকর্ম আপাতদৃষ্টিতে সহজ সরল। কিন্তু সে কেবলমাত্র মুখোশ। মুখোশের অন্তরালে সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকে ঠকবাজীর মাধ্যমে নিজের আখের গোছানোর মানসিকতা। তাঁর ফাঁকি দেওয়ার আধুনিক কৌশল পাঠককে বিস্মিত করে। চরিত্রটি ধর্মের নামে সমসাময়িক সমাজের ভন্ডামিকে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

শ্যামানন্দের মতই এ গল্পের আরেকটি আকর্ষণীয় চরিত্র গন্ডেরিরাম বাটপারিয়া। অটল বলেছে, ''আমাদের শ্যামদা ও গন্ডেরিদা যেন মানিক জোড়''।[৫৬] সত্যিই তাই, উভয়েই অসম্ভব ধূর্ত এবং ধাপ্পাবাজ, উভয়েই ধর্মধ্বজী। ধূর্তামীতে গন্ডেরিরাম নিঃসন্দেহে শ্যামানন্দের থেকেও কয়েক ডিগ্রী ওপরে। অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে তার মোটা পরিমান অর্থলাভের কৌশল ও

পরিকল্পনা অনবদ্য। তাঁর হিন্দী বাংলা মেশানো বিচিত্র সংলাপ, বিভিন্ন শাস্ত্রে দখল, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ পাঠের অহমিকা, কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' পংক্তির বিকৃত উচ্চারণ ইত্যাদির মধ্যে নিহিত আছে কৌতুকরসের অফুরন্ত ভান্ডার। বীরেন্দ্র দত্ত তাঁর 'ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' গ্রন্থে এই চরিত্রটি সম্পর্কে বলেছেন :

> ''বস্তুত গন্ডেরির মত চরিত্র পরশুরামের অনবদ্য সৃষ্টি। এই চরিত্র দর্শনে পরশুরামের শিল্প ক্ষমতা অনন্ত মূল্যের মর্যাদা পায়। একটা সম্পূর্ণ বাস্তব, চতুর বিশ শতকীয় বুদ্ধি নির্ভর, 'ক্যালকুলেটিভ', বাচাল, রসিক, টাকা পয়সার হিসেব নিকেশে স্বার্থপর, পুণ্যের মাপবিচারে মোটা চামরার পশুর মত চরিত্র বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।''[৫৭]

এছাড়াও রয়েছে রায়সাহেব তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মেজাজ হাকিমের মত হলেও নজর অত্যন্ত নীচু। তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন কিন্তু এখনো খেতাবের আকাঙ্ক্ষা করেন। দৈব ব্যাপারে তার খুব একটা বিশ্বাস না থাকলেও কেবল লাভের আশায় শ্যামবাবুর কোম্পানীতে যোগ দিয়েছিলেন। হাকিমি মেজাজ ফলাতে পারলে তিনি বেজায় খুশী হন আর তাই তাকে কোম্পানীর ডিরেক্টর পদ দিয়ে কোম্পানীর অংশীদার করে নিতে শ্যামবাবুর খুববেশি বেগ পেতে হয়নি :

> '' তিনকড়িবাবু তামাক টানার অন্তরালে বলিতেছিলেন :
>
> ''দেখুন স্বামিজী, হিসেবেই হ'ল ব্যবসার সব। ডেবিট ক্রেডিট যদি ঠিক থাকে, আর ব্যালান্স যদি মেলে, তবে সে বিজনেসের কোন ভয় নেই।''
>
> শ্যামবাবু। আজ্ঞে, যথার্থ কথা বলেছেন। সেই জন্যেই তো আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে আমরা মধ্যে মধ্যে এসে বিরক্ত করব। হিসেব সম্বন্ধে পরামর্শ নেব।
>
> তিনকড়ি। বিলক্ষণ, বিরক্ত হব কেন। আমি সমস্ত হিসাব ঠিক করে দেব। মিটিংগুলো একটু ঘন ঘন করবেন। না হয় ডিরেক্টর ফি বাবদ কিছু বেশী খরচ হবে।''[৫৮]

আসলে ঘন ঘন মিটিং ডেকে ডিরেক্টরের ফি বাবদ তিনি কিছু অর্থ পকেটস্থ করতে চান। শুধু তাই নয় এ সূত্রে তিনি ঘাড়ের বোঝা শ্যামলিকাকে (কে?) কোম্পানীতে চাকরীর ব্যবস্থা করে দিতে চান। এমনকি বাড়ির পুরানো কাঁসার ঘন্টা কোম্পানীকে বিক্রি করেও তিনি

কিছু উপার্জন করতে চান। এই হল সুযোগ সন্ধানী, অর্থলোভী তিনকড়ির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এত হিসেবি তিনকড়িকেও বোকা হয়ে যেতে হয় শ্যামানন্দের চতুরতার কাছে। ডিরেক্টর হিসাবে মাসমাহিনার লোভ, শেয়ারের টাকার লোভ, স্বজনপোষণ ইত্যাদি সবকিছুই শ্যামানন্দের কৌশলে শেষপর্যন্ত বিফলে যায়। কোম্পানী যখন বিশবাও জলে তখনও তিনি মাসিক একহাজার টাকার টোপ গিলে শ্যামবাবুর ১৬০০ শেয়ার কিনে আর ও ৩২০০ টাকার দায় ঘাড়ে নিলেন।

তিনকড়ি চরিত্রটির মাধ্যমে লেখক ইংরেজের অধীনে কাজ করা এদেশীয় হাকিমের একটি ব্যঙ্গচিত্র তুলে ধরেছেন। ইংরেজ তোষামোদই ছিল এজাতীয় সরকারী আমলাদের যোগ্যতার মাপকাঠি। এ সমস্ত ইংরেজ তোষামোদকারী দেশীয় আমলাদের স্বদেশপ্রীতিকেও তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন পরশুরাম তিনকড়ি চরিত্রের মাধ্যমে। ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছিলেন :

''তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গোরু
শিখিনি শিং বাঁকানো কেবল খাব খোল-বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা।
গামলা ভাঙে না
আমরা ভুসি পেলেই খুশি হব ঘুঁসি খেলে বাঁচব না।।''[৫৯]

আর তিনকড়ি কোল্ডহাম সাহেবকে লিখেছেন :

''হুজুর তোমরা রাজার জাত, দু-ঘা দাও তাও সহ্য হয়। কিন্তু দেশী বাঙ্গালীর লাথি সহ্য করব না।''[৬০]

ধর্মের নামে ভন্ডামিকে, কুসংস্কারকে অথবা ধর্মের নামে মানবিকতার অবক্ষয়কে ব্যঙ্গ করা ব্যঙ্গসাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্য। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্যি। কারণ ভারতবর্ষের মানুষ ধর্মপ্রাণ। এখানকার সবকিছুই ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমনকি রাজনীতিও। কিন্তু মধ্যযুগে বসে ধর্মকে ব্যঙ্গ করার সাহস ছিল না কারও। কারণ ধর্ম সেখানে ব্যঙ্গের বিষয় নয় শ্রদ্ধার বিষয় ছিল। তাই কোন সাহিত্যিকই ধর্মকে ব্যঙ্গ করে কিছু লেখার সাহস দেখাতে পারেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম ভারতচন্দ্র। আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে বসে তিনি তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দেবতাদের ভাঁড়ামিকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার সাহস দেখালেন। এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কল্পতরু), যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (নেড়া হরিদাস) তীব্রভাবেই ধর্মকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করলেন। পরশুরাম এদেরই সার্থক উত্তরসূরি।

ব্যক্তিজীবনে রাজশেখর ধর্ম বিষয়ে ছিলেন উদারমতালম্বী। ধর্মের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান তাঁর কাছে সেভাবে মূল্য পায়নি। 'সাহিত্যিকের ব্রত' প্রবন্ধে রাজশেখর ধর্ম বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত স্পষ্ট করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন :

''ধর্মের অর্থ সমাজহিতকর বিধি, ধর্মপালনের অর্থ সামাজিক কর্তব্যপালন। এই ধর্মবোধ লুপ্ত হওয়ায় সমাজ ব্যাধিগ্রস্থ হয়েছে, অসংখ্য বীভৎস লক্ষণ সমাজদেহে ফুটে উঠেছে।''[৬১]

'বিলাতী খ্রীষ্টান ও ভারতীয় হিন্দু' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> ''স্বামী, বাবা, ঠাকুর ইত্যাদি উপাধিধারী অনেক মন্ত্রদাতা গুরুর উদ্ভব হয়েছে, এঁদের শিষ্যও অসংখ্য। এই শিষ্যরা কেবল ধর্ম কামনায় বা পারমার্থিক জ্ঞানলাভের জন্য অথবা শোকদুঃখে সান্ত্বনার জন্য গুরুবরণ করেন না; অনেকে বিশ্বাস করেন যে তাঁদের চাকরির উন্নতি, ভাল জায়গায় বদলি এবং রোগের নিবৃত্তিও গুরুর অলৌকিক শক্তি বলে সাধিত হবে। সব রকম সাংসারিক সংকটে তাঁরা গুরুর উপর নির্ভর করে থাকেন।...এ দেশের শিক্ষিত সমাজের অন্ধবিশ্বাস বিলাতী শিক্ষিত সমাজের তুলনায় অনেক বেশী।''[৬২]

আবার 'জাতিচরিত্র' প্রবন্ধেও রয়েছে ধর্ম বিষয়ে রাজশেখরের স্পষ্ট মতামত। এখানে তিনি বলেছেন :

> ''আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশের মত নেশাখোর নই, কিন্তু একটা প্রবল মানসিক মাদক এ দেশের জনসাধারণকে অভিভূত করে রেখেছে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তার থেকে মুক্ত নয়। আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি বলে গর্ব করি, কিন্তু আমাদের ধর্মের অর্থ প্রধানত বাহ্য অনুষ্ঠান, নানা রকম অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস, এবং ভক্তির চর্চা। অর্থাৎ পুরোহিত মারফত পূজা, কবচ-মাদুলি, আর যদি ভক্তি থাকে তবে ইষ্টদেবের আরাধনা।...আমাদের যেটুকু পুরুষকার আছে দৈবের উপর নির্ভর করে তাও বিনষ্ট হচ্ছে।... ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ করে। অর্থাৎ সমাজহিতকর বিধি সমূহই ধর্ম।''[৬৩]

সুতরাং বলা যায় ধর্ম বিষয়ে রাজশেখরের মনোভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। কোনরকম কুসংস্কার তাঁর ধর্মবোধকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ধর্মের নামে মানবিকতার লাঞ্ছনা তাঁকে পীড়িত করেছে। তাই সমাজ জীবনে যখনই ধর্মের নামে ভন্ডামি দেখেছেন, তখনই প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন। সেই

ভন্ডামিকে ব্যঙ্গ করে রচনা করেছেন গল্প। রাজশেখরের বহু ছোটগল্পে রয়েছে ধর্মের নামে ভন্ডামির ব্যঙ্গচিত্র।

ধর্মকে আশ্রয় করে ভন্ডামির একটি ভিন্ন রূপ অঙ্কণ করেছেন পরশুরাম তাঁর **'বিরিঞ্চিবাবা'** গল্পে। অলৌকিকতার প্রতি আস্থা যুগ যুগ ধরে সকল দেশের মানুষকে প্রভাবিত করে চলেছে। যা কিছু অলৌকিক তার প্রতি মানুষের কৌতূহল সীমাহীন। আর যে সমস্ত মানুষ এই অলৌকিকের কারবারি তাদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাও সীমাহীন। আর এর সুযোগ নিয়ে অলৌকিকের কারবারিরা তাদের কারবার চালিয়ে যায় নির্দ্বিধায়। সাধারণের চোখে এই অলৌকিকের কারবারিরা মহৎ ব্যক্তি বলে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু একটু যুক্তি দিয়ে ভাবলে দেখা যায় যে এর মধ্যে নিহিত রয়েছে কত বড় ভন্ডামি! পরশুরাম 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে এই ভন্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এর পাশাপাশি যে সমস্ত মানুষ নিজেরা শিক্ষিত হয়েও এই অলৌকিকতাকে মননে ও মেজাজে প্রশ্রয় দেন, যাদের আশ্রয়ে বিরিঞ্চিবাবার মত ভন্ড তপস্বীরা অলৌকিকতার পশার জমিয়ে তোলেন তাদের প্রতিও বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেছেন।

'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে দেখি ভন্ড সাধু বিরিঞ্চিবাবা আশ্রয় নিয়েছেন গুরুপদবাবুর বাড়িতে। গুরুপদবাবু আলিপুরের উকিল। তিনি নাস্তিক গোছের মানুষ। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভদ্রলোক একেবারে বদলে গেছেন। এখন বিরিঞ্চিবাবাই তার ধ্যান জ্ঞান। তাই তার বড় মেয়ে নিরূপমা, ননীবাবুর সঙ্গে যার বিবাহ হয়েছে, বড়ই চিন্তগ্রস্থ। খবরটি পৌঁছায় চোদ্দ নম্বর হাবসীবাগান লেনের মেসে। কলেজের শিক্ষক নিবারণ, ইনসিওরেন্সের দালাল পরমার্থ, শিক্ষিত বেকার সত্যব্রত এই মেসের সদস্য। পাশের বাড়ির নিতাবাবু এখানে এসে প্রায়ই আড্ডা দেন। এই মেসেই একদিন আলোচনাসূত্রে বিরিঞ্চিবাবার প্রসঙ্গ উঠে আসে। বিরিঞ্চিবাবা সম্পর্কে তারা জানতে পারে :

> ''কেউ বলে তাঁর বয়স পাঁচশ বৎসর, কেউ বলে পাঁচ হাজার, অথচ দেখতে এই নিতাই-এর বয়সী বলে বোধহয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে একটু হেসে বলেন : ''বয়স বলে কোন বস্তু নেই। সমস্ত কাল একই কাল; সমস্ত স্থান—একই স্থান।''''[৬৪]

নিতাই বিরিঞ্চিবাবার প্রসঙ্গ শুনে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদগ্রীব হয়। কিন্তু নিবারণ, সত্যব্রত এর মধ্যে ভন্ডামির আঁচ পায়। তারা গুরুপদবাবুর বাড়িতে হাজির হয়। তারা সেখানে গিয়ে জানতে পারে যে রোজ দু-তিনশ ভক্ত গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছে। বিরিঞ্চিবাবার অদ্ভুত কথাবার্তা শোনার জন্য তারা হা করে আছে। প্রতি রবিবার রাতে সেখানে হোম হয়। তা থেকে নাকি এক এক দিন এক-একটি দেবতার আবির্ভাব হয়—কোনও দিন রামচন্দ্র, কোন দিন ব্রম্মা, কোনদিন

যিশু, কোনদিন শ্রী চৈতন্য। যাকে তাকে হোমঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। যারা খুব বেশী ভক্ত তারা একমাত্র সেখানে যেতে পারে। নিবারণ সত্যব্রতরা বুঝতে পারে গোটাটাই ভন্ডামি। তারা প্রথমে বাড়ির চাকরবাকরকে হাত করে। রাত ৯টা, হোম আরম্ভ হয়েছে :

> ''সহসা হোমকুন্ড থেকে নীলাভ অগ্নিশিখা নির্গত হইল। সেই ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকে সকলে দেখিলেন—মহাদেবই তো বটে!—হোম কুন্ডের পশ্চাতে ব্যঘ্র চর্মধারী হার মালা বিভূষিত পিনাক ডমরুপানি ধবলকান্তি দম্ভুর মত মহাদেব।''[৬৫]

এমন সময় চাকর বাকররা পূর্ব শিক্ষা মত চিৎকার করে উঠল—'আগলাগা হ্যায়।' আগুন-আগুন-বেরিয়ে আসুন শিগগির।' এই আগুনের শিখাতেই বেড়িয়ে পড়ল আসল রহস্য। মহাদেব পিছনের দরজা দিয়ে পলায়নের চেষ্ট করলে তাকে সত্যব্রত ধরে ফেলেন। উদঘাটিত হয় বিরিঞ্চিবাবার ভন্ডামি।

'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের মূলরস কৌতুকরস। এই কৌতুকরস সৃষ্টি হয়েছে মূলত সংলাপের মাধ্যমে। যেমন মিষ্টার সেন বিরিঞ্চিবাবাকে জিজ্ঞেস করেছে :

> ''এক্সকিউজ মি প্রভু, আপনি কি জিসাস ক্রাইষ্টকে জানতেন?
>
> বিরিঞ্চি। হা: হা: যিশু তো সেদিনকার ছেলে।
>
> মিষ্টার সেন। মাই ঘড।''[৬৬]

এ ছাড়া গৌণ চরিত্রগুলির সংলাপ, বিভিন্ন প্রকার বাবাদের নিয়ে গালগল্প, অলৌকিকতা নিয়ে বিভিন্ন প্রকারের হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতির আলোচনা 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পটিকে আদ্যন্ত হাস্যরসাত্মক করে তুলেছে। সবশেষে হোমঘরে বসে বাড়িতে আগুন লাগার সংবাদ শুনে নকল মহাদেবের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় সত্যব্রত তাকে জাপটিয়ে ধরলে মহাদেবের নিজেকে ছাড়ানোর জন্য আর্তি পাঠককে কৌতুকরসে ভরিয়ে তোলে। প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ''মহাদেব বলিলেন—আঃ ছাড়-ছাড়-লাগে মাইরি, এখন ইয়ারকি ভলোলাগে না—চার্দ্দিকে আগুন—ছেড়ে দাও বলছি।''[৬৭]

'গুরু বিদায়' গল্পে পরশুরাম গুরুদেবের ভন্ডামির আর একটি ভিন্ন চিত্র অঙ্কণ করেছেন। এ গল্পে ভন্ডামির চিত্র হয়তো বিরিঞ্চিবাবার মত প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু পরশুরাম তাঁর কলমের সূক্ষ্ম আঁচড়ে গুরুদেবের ভন্ডামির এক সূক্ষ্ম দিককে তুলে ধরেছেন এ গল্পে।

বংশলোচনবাবুর স্ত্রী মানিনী দেবী। হঠাৎ একদিন মানিনী দেবীর খেয়াল হল ধর্ম কর্মে মন দিয়ে মন্তর-টন্তর নিতে। বংশলোচন বৈঠকখানায় এসে তার অন্তরঙ্গদের কাছে পত্নীর

অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। উপযুক্ত গুরুর সন্ধান নিয়ে বিস্তর আলোচনার পর বংশলোচনের শ্যালক নগেন দিদির গুরুর সন্ধান দিলেন। বালিঞ্জের খল্বিদংস্বামী—''আ্যসা সুন্দর গাইতে পারেন! চেহারাটিও তেমনি, বয়সে এই জামাইবাবুর চেয়ে কিছু কম হবে।...এখন তার প্রায় দুশ শিষ্যা।''[৬৮] মানিনী দেবীরও খল্বিদং স্বামীকে পছন্দ হল। দীক্ষার আগের দিন খল্বিদং নিজে ঘুরে ঘুরে সমস্ত আয়োজন তদারক করছেন। হঠাৎ তার নজরে পড়ল—একটি বৃহদাকার ছাগল তাকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করছে। স্বামীজি জানতে পারলেন ছাগলটির নাম লম্বকর্ণ এবং মানিনী দেবী তাকে অত্যন্ত ভলোবাসেন। খল্বিদংস্বামী লম্বকর্ণকে দেখে বললেন—''শ্রী ভগবানের কি অপূর্ব সৃষ্টি এই জীবটি। বেঁচে থাকার যে আনন্দ, তা এতে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। প্রাণশক্তি যেন সর্বাঙ্গে উথলে উঠেছে।''[৬৯] স্বামীজি লম্বকর্ণকে ডাকতে লাগলেন—'আ-তু তু তু।' লম্বকর্ণ এল না। স্বামিজী বললেন:

> ''আহা অবোধ জীব, কিঞ্চিৎ ভীত হয়েছে। আমাকে এখনও চেনে না কিনা। তোমরা ওকে তাড়া দিও না, জীবকে আকর্ষণ করার উপায় হচ্ছে অসীম করুণা, অগাধ তিতিক্ষা।''[৭০]

কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে লম্বকর্ণ যা ঘটাল তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না :

> ''কিছুদূর পিছু হটিয়া লম্বকর্ণ মুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তারপর ঘাড় নীচু করিয়া শিং বাকাইয়া স্বামীজির নধর উদর নিশানা করিয়া নক্ষত্রবেগে সম্মুখে ছুটিল।...নিমেষের মধ্যে লম্বকর্ণের প্রচন্ড গুঁতা ধাই করিয়া লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিল, খল্বিদং একবার মাত্র বাবাগো বলিয়া ডিগবাজী খাইয়া ধরাশায়ী হইলেন।''[৭১]

এরপর স্বামীজিকে ডাক্তার দেখানো হল। স্বামীজি সুস্থ হলেন। কিন্তু গো ধরে বসলেন : ''এ বাড়িতে দুজনের স্থান নেই, হয় আমি নয় ঐ ব্যাটা।'' অর্থাৎ লম্বকর্ণ। মানিনী দেবী ছাগলটিকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চাইলেন না। ফলে বিদায় নিতে হল স্বামীজিকেই।

'গুরু বিদায়' গল্পে হাস্যরসের মূল বিষয় হল অসঙ্গতি। মানুষ স্বভাবতই প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়। কিন্তু গুরুদেবের মত মহান মানুষেরা সবসময়ই করুণার বাণী শুনিয়ে প্রেমের মন্ত্র শুনিয়ে মানুষকে যথার্থ মানুষ করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। আলোচ্য গল্পেও খল্বিদং স্বামী তাঁর অন্তঃস্থিত করুণার ভান্ডার প্রদর্শনের জন্য লম্বকর্ণকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন :

''শ্রী ভগবানের কি অপূর্ব সৃষ্টি এই জীবটি। বেঁচে থাকার যে আনন্দ তা এতে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। প্রাণশক্তি যেন সর্বাঙ্গে উথলে উঠছে।''[৭২]

এই করুণার বাণী নিমেষেই প্রতিহিংসায় পরিণত হয়েছে যখন লম্বকর্ণ তার প্রচন্ড শক্তি প্রদর্শন করে গুরুদেবকে ধরাশায়ী করল। যে স্বামীজি লম্বকর্ণের মধ্যে ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টির সন্ধান পেয়েছিলেন সেই তিনিই ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে গিয়ে তাকে 'মূর্তিমান পাপ' বলতে দ্বিধা করলেন না। শুধু তাই নয় লম্বকর্ণকে বাড়ি থেকে তাড়াবার অন্যায় দাবিও তিনি করে বসলেন। এর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে পড়ল মুখোশের অন্তরালে থাকা গুরুদেবের চরিত্রের সত্যকারের স্বরূপ। গুরুদেব খল্বিদং স্বামীর চরিত্রের এই অসংগতিই এ গল্পে হাস্যরসের মূল উৎস। এছাড়া প্রবীণ কেদার চাটুয্যের বিচক্ষণ মন্তব্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উকিল বিনোদের সকৌতুক পরামর্শ, মানিনী দেবীর ভক্তির আতিশয্যে স্বামীজীর চর্বিত আখের ছিবড়া পরম ভক্তি সহকারে চিবানো এ গল্পে কৌতুকের পরিবেশ রচনা করেছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসককে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে বিশ্বসাহিত্যে প্রচুর গল্প লেখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ফরাসী নাট্যকার মোলিয়ের (১৬২২-১৬৭৩) ও আইরিশ নাট্যকার বার্নাড 'শ (১৮৫৬-১৯৫০)-এর কথা। তারা চিকিৎসক এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। মোলিয়রের শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্র Sganerelle (`Sganerelle`) এবং বার্ণাড শ'য়ের ডাক্তার B.B বা Doctor Sir Ralph Bloomfield Bonington (``The `s Dilemma``) দুজনেই বিখ্যাত চিকিৎসক। অথচ দুজনের কেউই তথাকথিত শিক্ষিত ডাক্তার নন। ডাক্তার B.B অনায়াসেই ধনুষ্টংকারের রোগীকে টাইফয়েডের ওষুধ দিয়েছেন আর টাইফয়েডের রোগীকে দিয়েছেন ধনুষ্টংকারের ওষুধ। আর Sganerelle দেহের ডানদিকে হৃৎপিন্ড এবং দেহের বামদিকে যকৃতের পরীক্ষা করেন এবং সেই অনুযায়ী ওষুধ দেন। আসলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকেরা অজ্ঞ হলেও তাদের আত্মবিশ্বাস সীমাহীন। তাই শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন :

> ''সবাই অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়, সবাই নিজেদের বাহাদুরি দেখাইতেই ব্যস্ত, কারণ সকলের মূলধনই ধাপ্পাবাজি; ইহাদের ভাষার প্রকারভেদ থাকিলেও সকলের বুলিই অর্থহীন প্রলাপ আর সকলের লক্ষ্যই রোগীর পকেট।''[৭৩]

মলিয়ের কিম্বা বার্নাড শ'য়ের মতো ব্যঙ্গ সাহিত্যিকেরা চিকিৎসক এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার ভন্ডামির এই দিকগুলিকে ব্যঙ্গ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর কিছু ছোটগল্পে চিকিৎসকদের নিয়ে অল্পসল্প রসিকতা করলেও পরশুরামই সর্বপ্রথম এদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ

করে সার্থক ছোটগল্প রচনা করেছেন। চিকিৎসকদের নানা মূদ্রাদোষ একে অপরকে কাঁদাছোড়া, নিজেকে চিকিৎসক সম্রাট বলে প্রতিপন্ন করার জন্য ফন্দী ইত্যাদি এ গল্পগুলির বিষয়। **'চিকিৎসা সংকট'**, **'যদুডাক্তারের পেশেন্ট'** প্রভৃতি গল্পগুলি এধরণের গল্প।

'চিকিৎসা সংকট' গল্পে শ্রী নন্দদুলাল মিত্রের চিকিৎসা সংকট দেখানো হয়েছে। চলন্ত গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে নন্দ পড়ে গেলে সে সামান্য আঘাত পায়। নন্দ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর টাকার মালিক। তাই তাঁর সামান্য আঘাত নিয়ে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে চলে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। গুপি, বঙ্কু, নিধু, ষষ্ঠীবাবু প্রমুখরা নন্দর বন্ধু। তারা তাকে বিভিন্নভাবে উপদেশ দেয়। কেউ তাকে উপদেশ দেয় এ্যালোপেথী চিকিৎসার, কেউ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার আবার কেউ বা তাকে হাকিমের কাছে যাবার পরামর্শ দেয়। এরপর নন্দবাবুর বিভিন্ন চিকিৎসকদের কাছে যাওয়া এবং তাদের রোগ নির্ণয় এবং তাদের চিকিৎসার ধরণ নিয়ে বিভিন্ন চিকিৎসকদের অদ্ভুত মন্তব্য গল্পটিতে পরিবেশিত হয়েছে যা একই সঙ্গে জন্ম দিয়েছে হাস্যরস ও বিস্ময়রসের। শেষপর্যন্ত কোন চিকিৎসাতেই আর তাঁর আস্থা থাকে না। অবশেষে সে যায় ডাক্তার মিস বিপুলা মল্লিকের কাছে। সেই তার আসল রোগ ধরতে পারে। মিস মল্লিক তাকে পরামর্শ দেন 'আপনার শুধু একজন অভিভাবক দরকার।' এরপর মিস মল্লিকের সঙ্গে সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। লেখক জানিয়েছেন :

> ''মিসেস বিপুলা মিত্র এখন স্বামী ভিন্ন অপর রোগীর চিকিৎসা করেন না। তবে নন্দবাবু ভালই আছেন। মোটর কার কেনা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় সান্ধ্য আড্ডাটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।''[৭৪]

শ্রী নন্দদুলাল মিত্রের চিকিৎসা সূত্রে আমরা এ গল্পে পরিচয় পেয়েছি একাধিক চিকিৎসকের। এদের কেউ এ্যালোপেথী চিকিৎসক, কেউ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক, কেউ বা কবিরাজ। চিকিৎসা পদ্ধতি এদের ভিন্ন হলেও মিল রয়েছে একটি ক্ষেত্রে। এরা সকলেই ধাপ্পাবাজ। এদের ভাষার প্রকারভেদ থাকলেও সকলের বুলিই অর্থহীন প্রলাপ আর সকলেরই লক্ষ্য রোগীর পকেট। এদেরকে কেন্দ্র করে যে হাস্যরস এ গল্পে সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অনবদ্য। এদের প্রত্যেকের চিকিৎসা পদ্ধতির অসংগতি পাঠককে উতরোল হাস্যরসে মাতিয়ে তোলে। একই সঙ্গে সমসাময়িক চিকিৎসা পদ্ধতির অসাড়ত্ব আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। যেমন ডাক্তার তরফদারের চিকিৎসা ব্যবস্থা :

> ''একজন স্থূলকায় মারোয়ারী নগ্ন গাত্রে দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার ফিতা দিয়া তাঁহার ভুড়ির পরিধি মাপিয়া বলিলেন : ''বস্, সোয়া ইঞ্চি বঢ় গিয়া।'' রোগী খুশী

হইয়া বলিল, ''নবজ্ তো দেখিয়ে। রোগী বলিল—জবান তো দেখিয়ে। রোগী হাঁ করিল, ডাক্তার ঘরের অপরদিকে দাঁড়াইয়া অপেরা গ্লাস দ্বারা তাহার জিব দেখিয়া বলিলেন,

'থোরেসি কসর হ্যায়। কল ফিন আনা।'

রোগী চলিয়া গেলে তফাদার নন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'ওয়েল?

নন্দ বলিলেন 'আজ্ঞে বড় বিপদে পড়ে আপনা কাছে এসেছি। কাল হঠাৎ ট্রাম থেকে—

তফাদার। কম্পাউন্ড ফ্রাকচার? হাড় ভেঙ্গেছে?

নন্দ আনুপূর্বিক তাহার অবস্থার বর্ণনা করিলেন। বেদনা নাই, জ্বর হয় না, পেটের অসুখ সর্দি, হাপানি নাই। ক্ষুধা কাল হইতে একটু কমিয়াছে। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। মনে বড় আতঙ্ক।

ডাক্তার তাঁহার বুক পেট মাথা হাত পা নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'জিব দেখি।'

নন্দবাবু জিব বাহির করিলেন।

ডাক্তার ক্ষণকাল মুখ বাঁকাইয়া কলম ধরিলেন। প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ হইলে নন্দর দিকে চহিয়া বলিলেন—আপনি এখন জিব টেনে নিতে পারেন। এই ওষুধ রোজ তিনবার খাবেন।'

নন্দ। কি রকম বুঝলেন?

তফাদার। ভেরি ব্যাড।

নন্দ সভয়ে বলিলেন—'কি হয়েছে?'

তফাদার। আরও দিন কতক ওয়াচ না করলে ঠিক বলা যায় না। তবে সন্দেহ করছি Cerebral tumour with strangulated ganglia.

ট্রি ফাইন ক'রে মাথার খুলি ফুটো করে অস্ত্র করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের

জট ছড়াতে হবে। শটসার্কিট হয়ে গেছে।

নন্দ। 'বাঁচব ত?'

তফাদার। দমে যাবেন না, তা হ'লে সারাতে পারব না। সাত দিন পরে ফের আসবেন। মাইফ্রেন্ড মেজর গোঁসাইয়ের সঙ্গে একটা কন্‌সল্‌টেশনের ব্যবস্থা করা যাবে। ভাত ডাল বড় একটা খাবেন না। এগ-ফ্লিপ, বোন ম্যারো সুপ, চিকেন-স্টু এইসব। বিকেলে একটু বার্গন্ডি খেতে পারেন। বরফ-জল খুব খাবেন। হ্যাঁ বত্রিশ টাকা।

হোমিওপ্যাথি ডাক্তার নেপালের চিকিৎসা ব্যবস্থা :

''নেপাল। শ্বাস উঠেছে?

নন্দ। আজ্ঞে?

নেপাল। রুগীর শেষ অবস্থা না হ'লে তো আমায় ডাকা হয় না, তাই জিজ্ঞেস করছি। নন্দ সবিনয়ে জানাইলেন তিনি রোগী।

নেপাল। অ্যালোপ্যাথ ডাকাত ব্যাটারা ছেড়ে দিলেন যে বড়? তোমার হয়েছে কি?

নন্দবাবু তাহার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলেন।

নেপাল। তফাদার কি বলেছে?

নন্দ। বললেন আমার মাথায় টিউমার আছে।

নেপাল। তফাদারের মাথায় কি আছে জান? গোবর। আর টুপির ভেতর শিং, জুতোর ভেতর খুর, পাতলুনের ভেতর ল্যাজ। খিদে হয়?

নন্দ। দু-দিন থেকে একেবারে হয় না।

নেপাল। ঘুম হয়?

নন্দ। না।

নেপাল। মাতা ধরে?

নন্দ। কাল সন্ধ্যাবেলা ধরেছিল।

নেপাল। বাঁ দিক।

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

নেপাল ধমক দিয়া বলিলেন—'ঠিক ক'রে বল।'

নন্দ। আজ্ঞে ঠিক মধ্যিখানে।

নেপাল। পেট কামড়ায়?

নন্দ। সেদিন কামড়ে ছিল। নিধে কাবলিমটর ভাজা এনেছিল তাই খেয়ে—

নেপাল। পেট কামড়ায় না মোচড় দেয় তাই বল।

নন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন—হাঁচোড়-পাঁচোড় করে।'

ডাক্তার কয়েকটি মোটো মোটা বহি দেখিলেন, তারপর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া

বলিলেন—'হুঁ । একটা ওষুধ দিচ্ছি নিয়ে যাও। আগে শরীর থেকে অ্যালোপ্যাথিক বিষ তাড়াতে হবে। পাঁচ বছর বয়সে আমায় খুনে ব্যাটারা দু-গ্রেন কুইনীন দিয়েছিল, এখনও বিকেলে মাথা টিপ টিপ করে। সাত দিন পরে ফের এসো। তখন আসল চিকিৎসা শুরু হবে।'

নন্দ। ব্যাপারটা কি আন্দাজ করছেন?

ডাক্তার ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন—'তা জেনে তোমার চারটে হাত বেড়বে নাকি? যদি বলি তোমার পেটে ডিফারেনশ্যাল ক্যাল্‌কুলাস হয়েছে, কিছু বুঝবে? ভাত খাবে না, দু-বেলা রুটি, মাছ-মাংস বারণ শুধু মুগের ডালের জুষ, স্নান বন্ধ, গরম জল একটু খেতে পার, তামাক খাবে না, ধোঁয়া লাগলে ওষুধের গুণ নষ্ট হবে। ভাবছো আমার আলমারীর ওষুধ নষ্ট হয়ে গেছে? সে ভয় নেই, আমার তামাকে সালফার থার্টি মেশানো থাকে।

তারিণী কবিরাজের চিকিৎসা ব্যবস্থা :

''তারিণী। রুগির ব্যামোডা কি ?

নন্দবাবু জানাইলেন তিনিই রোগী এবং সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিলেন।

তারিণী। মাথার খুলি ছেঁদা করে দিয়েছে নাকি ?

নন্দ। আজ্ঞে না, নেপাল বাবু বললেন পাথুরি, তাই আর মাথায় অস্তর করাইনি।

তারিণী। নেপাল সে আবার কেডা?

নন্দ। জানেন না ? চোরাবাগানের নেপালচন্দ্র রায় M.B.F.T.S-MSX হোমিওপ্যাথ।

তারিণী। অঃ ন্যাপলা, তাই কও। সেডা আবার ডাগদার হল কবে? বলি পাড়ায় এমন বিচক্ষণ কোবরেজ থাকতি ছেলে ছোকরার কাছে যাও কেন?

নন্দ। আজ্ঞে, বন্ধু-বান্ধবরা বললে ডাক্তারের মতটা আগে নেওয়া দরকার। যদি অস্ত্র চিকিৎসা করতে হয়।

তারিণী। তাঁর মামার হয় উরুস্তম্ভ। সিভিল সার্জন পা কাটলে। তিনদিন অচৈতন্য। জ্ঞান হলি পর কইলেন, আমার ঠ্যাং কই? ডাক তারিণী স্যানরে। দেলাম ঠুকে একদলা চবনপ্রাশ। তার পর কি হ'ল কও দিকি?

নন্দ আবার পা গজিয়েছে বুঝি?

.....

দ্যাও নাড়ীডা একবার দেখি। হুঃ যা ভাবছিলাম তাই। ভারী ব্যামো হয়েছিল কখনও?''

নন্দ। অনেকদিন আগে টাইফয়েড হয়েছিল।

তারিণী। ঠিক ঠাউরেছি। পাঁচ বছর আগে?

নন্দ । প্রায় সারে সাতবছর হ'ল।

তারিণী । একই কথা, পাচ দেরা সারে সাত। প্রাতিকালে বোমি হয়?

নন্দ । আজ্ঞে না।

তারিণী । হয় Zানতি পার না। নিদ্রা হয়?

নন্দ । ভাল হয় না।

তারিণী । হবেই না তো। উর্ধু হয়েছে কিনা। দাত কনকন করে?

নন্দ । আজ্ঞে না।

তারিণী । করে, Zানতি পার না। যা হোক, তুমি চিন্তা কোরোনি বাবা। আরাম হয়ে যাবানে। আমি ওষুধ দিচ্ছি।

কবিরাজ মহাশয় আলমারী হইতে একটি শিশি বাহির করিলেন, এবং তাহার মধ্যস্থিত বড়ির উদ্দেশ্যে বলিলেন—লাফাসনে, থাম্ থাম্। আমার সব জীয়ন্ত ওষুধ, ডাকলি ডাক শোনে। এই বড়ি সকাল সন্ধ্যি একটা করি খাবা। আবার তিনদিন পর আস্বা। বুজেচ?'

নন্দ । আজ্ঞে হাঁ।

তারিণী । ছাই বুঝেচ। অনুপান দিতি হবে না? ট্যাবা লেবুর রস আর মধুর সাথি মাড়ি খাবা। ভাত খাবা না। ওল সিদ্ধ, কচু সিদ্ধ এই সব খাবা। নুন ছোবা না। মাগুর মাছের ঝোল একটু চ্যানি দিয়া রাঁধি খাতি পার। গরমজল ঠান্ডা করি খাবা।

নন্দ । ব্যারাম টা কি?

তারিণী । যারে কয় উদুরি। উর্ধ্ব শ্লেষ্মাও কইতি পার।''

নন্দবাবু কবিরাজের দর্শনী ও ঔষধের মূল্য দিয়া বিমর্ষচিত্তে বিদায় লইলেন।

এরপর নন্দবাবু গেলেন হাকিম সাহেবের কাছে। হাকিম নন্দবাবুর রোগ নির্ণয় করে বললেন 'হড্ডি পিল্‌পিলায় গয়া।'[৭৫]

এই সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা আর যাই হোক কখনোই সুষ্ঠু চিকিৎসা পদ্ধতিকে সমর্থন করে না। এই চিকিৎসা ব্যাবস্থাকেই পরশুরাম তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেছেন এখানে। এছাড়া পরশুরাম এমনকিছু সংলাপ বিভিন্নচরিত্রের মুখে বসিয়েছেন এবং সিচুয়েশন সৃষ্টি করেছেন যা গল্পটিতে নির্ভেজাল হাস্যরসের আস্বাদ এনে দেয়। তারিণী কবিরাজের মুখে বারবার 'হয়, জানতি পার না।' অথবা 'অঃ, ন্যাপলা', প্রভৃতি উচ্চারণ নিঃসন্দেহে কৌতুকরসের অবতারণা করেছে। নন্দর বন্ধুদের কথাবার্তাগুলিও এ গল্পে যথেষ্ট বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

''প্রত্যেকের বক্তব্যের মধ্যে স্বীয় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হইয়াছে এবং যদিও কাহারও সঙ্গে অপর কাহারও মত মেলে না তবু ইহাদের মন্তব্যগুলি এক অপরূপ বর্ণালী সৃষ্টি করিয়াছে।''[৭৬]

‘যদু ডাক্তারের পেশেন্ট’ গল্পেও আমরা একজন ডাক্তারের সন্ধান পাই তার নাম যদুনন্দন গড়গড়ি। ইনি কোথায় ডাক্তারি শিখেছিলেন, কলকাতায় কি বোম্বাই-এ, কি রেঙ্গুনে তা কেউ জানে না। কেউ বলে, ইনি সেকেলে ভি.এল.এম.এস। কেউ বলে ওসব কিছু নন, ইনি হচ্ছেন খাঁটি হ্যামার-ব্র্যান্ড, অর্থাৎ হাতুড়ে। নিন্দুকেরা যাই বলুক এককালে এঁর অসংখ্য পেশেন্ট ছিল, সাধারণ লোক এঁকে খুব বড় সার্জেন মনে করত। তিনি যে চিকিৎসা ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন তা আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। তিনি যেভাবে দুজন নারী পুরুষের ধর থেকে মুন্ড আলাদা হয়ে যাওয়ার পরেও তাদেরকে বাঁচিয়ে তোলার গল্প শুনিয়েছেন তা সত্যিই বিলাতী বিজ্ঞানের মুখে জুতো মারারই সামিল। অবশ্য সে কৃতিত্বের দাবিদার তিনি নন, বিঘোরানন্দ বাবা। মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা তার করায়ত্ত, সেই বিদ্যার সাহায্যে তিনি দুই প্রেমিক প্রেমিকা পঞ্চি আর জটিরামের ধড় থেকে মুন্ড আলাদা হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁদেরকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। শুধু তাই নয় সমস্ত রকম ডাক্তারি কোডকে চরম অবজ্ঞা করে পঞ্চির ধড়ে জটিরামের মুন্ডু আর জটিরামের ধড়ে পঞ্চুর মুন্ডু জুরে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে যদু ডাক্তারের কাজ ছিল শুধু খন্ড যোজন করা। খন্ড যোজন করতে গিয়ে :

> ‘‘অ্যানাস্থেটিক দরকার হল না, বিঘোর বাবা মাথায় আর গলায় হাত বুলিয়ে অসাড় করে দিলেন। কিন্তু ভোতা গুণ ছুঁচ আর খসখসে পাটের সুতলি দিয়ে চামড়া ফোঁরা গেল না। বিঘোর বাবা বললেন, এই পিদিম থেকে রেড়ির তেল নিয়ে ছুঁচ আর সুতোয় বেশ করে মাখিয়ে নাও। তাই নিলুম। লুব্রিকেট করার পর কাজ সহজ হল, আধ ঘন্টার মধ্যে মুন্ডুর সঙ্গে ধড় সেলাই করে ফেললুম।
>
> তারপর বিঘোর বাবাকে বললুম, এখন এদের শরীরে কিছু তাজা রক্ত পুরে দেওয়া দরকার। অভাবে পাঁচশ শিশি গ্লুকোজ-স্যালাইন। কিন্তু এই পাড়া গায়ে যোগার হবে কি করে? যদি নেহাতই বেঁচে যায় তবে এরপর কিছু দিন লিভার এক্সট্রাক্ট, ব্লডস পিল আর ভিগারোজেন খাওয়াতে হবে নইলে গায়ে জোর পাবে না।
>
> বিঘোর বাবা বললেন, ওসব ছাই ভস্ম চলবে না বাপু এখন এরা সমস্ত রাত ঘুমুবে। কাল সকালে জেগে উঠলে ঝোলা গুর দিয়ে খান কতক রুটি পথ্য করবে। তারপর বেলা হলে পঞ্চী ভাত চড়িয়ে দেবে। আর লঙ্কা বাটা দিয়ে কাঁকড়া চচ্চড়ি রাঁধবে। তাতেই বলাধান হবে। জটিরাম আবার গাঁজা খায়। নয়রে জটে? জটিরাম দাঁত বের করে বললেন হিঁ।

বিঘোরবাবা বললেন, বেশ তো, কাল সকালে আমার প্রসাদী ছিলিমে দু-এক টান দিস। এখন খাওয়া চলবে না, গলায় জোড় পোক্ত হতে চাঁর পাঁচ ঘন্টা সময় লাগবে। এখন খেলে সেলাইয়ের ফাঁক দিয়ে সব ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে। দেখ ডাক্তার তোমার ফী কিছু দেব না, আজ তুমি যা দেখলে তারই দাম লাখ টাকা।'' [৭৭]

এ গল্পটির আকর্ষণীয় দিক হল চিকিৎসা বিজ্ঞানের কমেডির সঙ্গে প্রেমের কমেডির সংমিশ্রণ। তবে এ গল্পের সৃষ্ট হাস্যরস অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেছে। যদিও অসম্ভবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে হাস্যরস তবু সেই অসম্ভবকেও সম্ভাব্য হতে হয়। নতুবা তা আজগুবী হিসেবেই গণ্য হয়। আজগুবি আর যাইহোক কখনোই শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের উৎস হতে পারে না। 'যদুডাক্তারের পেশেন্ট' গল্পেও এই আজগুবির ছড়াছড়ি। ধড় থেকে মুন্ড আলাদা হয়ে যাওয়ার পরেও তাদেরকে বাঁচিয়ে তোলার যে কাহিনি এখানে বিবৃত হয়েছে তা কোনভাবেই বিশ্বাস্য হতে পারে না। শুধু বাঁচিয়ে তোলা নয় একজনের ধড়ের সঙ্গে আরেকজনের মুন্ড জুরে দেওয়ার কাহিনি যখন শোনানো হয় তখন তা আরও আজগুবি ঠেকে।

(৩) সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধাচরণ বিষয়ক গল্প :

পরশুরাম কিছু গল্প লিখেছেন যেখানে সাহিত্যিকেরা তাঁর বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছে। নিজে একজন সাহিত্যিক হওয়ার সুবাদে এই সম্প্রদায়ের চারিত্রিক দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহল ছিলেন। দাম্ভিকতা ঈর্ষা ইত্যাদি চারিত্রিক দুর্বলতাগুলি তারা কীভাবে সযত্নে নিজেদের অন্তরে লালন করে চলে তা তিনি জানতেন। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির সূত্রেই সাহিত্যিকেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন এক হাস্যকর প্রতিযোগিতায়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলেছে এ ধরণের হাস্যকর প্রতিযোগিতা। গ্রীক নাটকের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি ব্যঙ্গরসিক অ্যারিষ্টফেনিস ইউরিপিদিসকে একাধিক প্রহসনের বিষয়ীভূত করেছেন। আবার বাংলা সাহিত্যের দিকে চোখ রাখলে আমরা দেখি 'ছুচ্ছন্দরি বধ', 'আনন্দ বিদায়ের' মত এমন কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে যাদের উদ্দেশ্য মহৎ সৃষ্টি এবং স্রষ্টার গৌরবকে ভূলুন্ঠিত করা। এ ধরণের প্রচেষ্টাকে পরশুরাম কটাক্ষ করেছেন তাঁর সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয়ক গল্পগুলিতে। পরশুরামের এ ধরণের গল্প হল 'রামধনের বৈরাগ্য', 'দুইসিংহ', 'বটেশ্বরের অবদান' প্রভৃতি।

'রামধনের বৈরাগ্য' গল্পে সাহিত্য স্রষ্টার গৌরব লুন্ঠনকারীদের পরশুরাম 'সাহিত্যিক' গুন্ডা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রামধন জানেন সাহিত্যে আর্থিক সাফল্য আর শিল্পগত সাফল্য এক জিনিস নয়। তিনি শিশুপাঠ্য পুস্তক, মার্কিন ডিটেকটিভ গল্প ও বিলিতি গল্পের

অনুকরণে যে বইগুলি লিখলেন সেগুলি বাজারে দারুণ কাটল। কিন্তু রামধন এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কারণ উচ্চ সমাজে তার কিছুই খ্যাতি হল না। তাই নরনারীর যৌন সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এক উচ্চাঙ্গ উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করলেন। গল্পটি ক্রমশঃ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হতে লাগল। কিন্তু উপসংহারে পৌঁছানোর পূর্বেই সাহিত্যিক গুন্ডাদের শাসানিতে তার এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে রামধন লেখালেখি ছেড়ে দিয়ে বিষ্ণুপ্রয়াগে পালিয়ে বাঁচলেন।

'দ্বান্দ্বিক কবিতা' গল্পে প্রচ্ছন্ন রয়েছে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কবি ও পত্রিকা সম্পাদকের প্রতি কটাক্ষ। এই সমস্ত কবিদের প্রতি পরশুরামের ব্যঙ্গ মিশ্রিত উপদেশ :

> ''আর, কবিতা লেখা খুব সোজা, দেদার চুরি করবে, ওখান থেকে এক লাইন, এখান থেকে এক লাইন নেবে, তার সঙ্গে নিজের কিছু জুড়ে দেবে। এখন গদ্য কবিতার যুগ, মিলের ঝঞ্ঝাট নেই, যা খুশি এলোমেলো করে সাজিয়ে দিলেই গদ্য কবিতা হয়ে যায়।''[৭৮]

যে সাহিত্য পত্রিকা উঠতি লেখকদের প্রকাশের মাধ্যম তা যে খুব সহজেই অর্থের বিনিময়ে আদর্শচ্যুত হয়ে পড়ে তা স্পষ্ট করেছেন পরশুরাম এ গল্পে :

> ''তরণী বলল, আরে ছ্যা, একে কি কবিতা বলে। 'ওগো আমার বঁধূ, তুমি ডুমুর ফলের মধু!' এরকম সেকেলে কাঁচা লেখা ছাপলে আমার পত্রিকা কেউ পড়বে না।
>
> রমেশ তার বউদিদির সঙ্গে পরামর্শ করে তৈরি হয়েই গিয়েছিল। বলল, আচ্ছা তরণী, তোমার পত্রিকার লাভ কত হয়?
>
> —লাভ কোথায়, এখনও ঘর থেকে গচ্ছা দিতে হয়।
>
> —তবে বলি শোন। প্রতিমাসে আমি পাঁচ-ছটা কবিতা আনব, প্রত্যেকটি ছাপবার জন্যে পাঁচ টাকা হিসেবে দেব। তাঁতে পঁচিশ—তিরিশ টাকা পাবে। রাজী আছ?
>
> তরণী সেন বলল, তা মন্দ কি, কাগজের খরচটা তো উঠবে। টাকা পেলে প্রতি সংখ্যায় দশটা কবিতা ছাপতে রাজী আছি। কিন্তু দেখ ভাই, নিতান্ত রাবিশ না হয়।
>
> —আরে না না। শংকরীদেবীর নামে ছাপা হবে বটে কিন্তু বেশীরভাগ আমার বউদিদি লিখবেন। তাঁর হাত খুব পাকা।''[৭৯]

'প্রেম চক্র' গল্পেও রয়েছে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা পত্রিকা সম্পাদকের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ। দক্ষতা ও প্রতিভা না থাকা সত্ত্বেও অনেকে হুজুগের বশে নতুন নতুন পত্রিকা প্রকাশ করে অথচ কিছুদিনের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যায়। এ ধরণের প্রচেষ্টাকে লেখক কটাক্ষ করেছেন 'প্রেমচক্র' গল্পে। যেমন একটি সংলাপে দেখি :

''বঙ্কা বললে—'গোঁপ এখন থাকুক। দাও ধাঁ করে একটি গল্প লিখে। একটা মাসিক পত্রিকা বার করেছি 'চিরন্তনি'।

'ক মাস বার হবে?'

'চিরকাল। এ পত্রিকা মরবে না, তুমি দেখে নিও। দস্তুর মত এস্টিমেট করে আটঘাট বেঁধে নামা হচ্ছে। পঁচিশজন নামজাদা লেখকের সঙ্গে কনট্রাক্ট করেছি। প্রতি সংখ্যায় উনিশটা গল্প—পাঁচটা সোজা প্রেম, দশটা বাঁকা প্রেম, চারটে লোম হর্ষক। প্রথম সংখ্যা প্রায় ছাপা হয়ে এল, কেবল শেষ ফর্মার লেখাটা যোগাড় হয়ে ওঠেনি, তাই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। দাও চট্‌পট্ একটা লিখে।''[৮০]

(৪) আদর্শবাদের ব্যঙ্গচিত্র বিষয়ক গল্প :

পরশুরাম তাঁর কিছু গল্পে অবাস্তব আদর্শবাদের ভুয়ো দর্শনকে কটাক্ষ করেছেন। বিশুদ্ধ আদর্শবাদের প্রতি পরশুরামের সমর্থন থাকলেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে অন্ধ আদর্শবাদ মানুষকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়, যে আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তবের কোন সংযোগ নেই সেই আদর্শবাদ চর্চার পরিনাম কখনোই সুখের হয় না। এই আদর্শবাদের চর্চাকে কটাক্ষবাণে বিদ্ধ করেছেন তিনি। 'অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা', 'সত্যসন্ধ বিনায়ক', 'ভবতোষ ঠাকুর', 'নিধিরামের নির্বন্ধ', 'অক্রূর সংবাদ' ও 'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ' প্রভৃতি গল্প এই পর্যায়ে পড়ে।

'অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা' গল্পে পরশুরাম এরকমই সংশয়বাদী আদর্শবাদের একটি ব্যঙ্গচিত্র পরিবেশন করেছেন অটলবাবু চরিত্রের মধ্য দিয়ে। অটলবাবু ভক্ত নন, কবি নন, ভাবুক নন, দার্শনিক নন, সরল বিশ্বাসীও নন। তিনি নানা বিষয়ে ঠোকর মেরেছেন কিন্তু কিছুই সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারেননি। তাঁর মূলধন কি তাই সঠিকভাবে তিনি জানেন না। লাভ লোকসানের হিসেব করবেন কি করে? তাই তার মৃত্যুর পর লেখকের সহানুভূতি মিশ্রিত কটাক্ষ:

''আশ্চর্য মানুষ, হরিনাম নয়, রামধুন নয়, তারক ব্রম্মনাম নয়, কিছুই শুনলেন না, ভদ্রলোক লাভ লোকসান কষতে কষতেই মরেছেন। বোধ হয় হিসেব মেলাতে পারেননি, দেখুন না ভ্রু একটু কুচকে রয়েছে।''[৮১]

'সত্যসন্ধ বিনায়ক' গল্পে অবাস্তব আদর্শবাদের ভুয়ো দর্শনকে পরশুরাম কটাক্ষ করেছেন বিনায়ক সামন্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে। অখ্যাত হলেও সে অসামান্য, মহাত্মা গান্ধীর মতই সে একগুয়ে সত্যাগ্রহী ছিল। শুধু পার্থক্য এই যে গান্ধীজী অবস্থা বুঝে রফা করতে পারতেন, কিন্তু বিনায়কের তেমন বুদ্ধি ছিল না। তাঁর সততা নিয়ে কখনই কারোর মনে প্রশ্ন দেখা দেয়নি। নির্ভয়ে সত্যের প্রচার করতে তিনি একটি নতুন দল গড়ে ছিলেন 'সত্যসন্ধ সংঘ'। কিন্তু তাঁর এই প্রশ্ন তাশের ঘরের মতই ভেঙ্গে গেল। যখন অচিরেই তাঁর দলের দশজন সদস্যের মধ্যে সাতজন পালিয়ে গেল। আসলে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের যে নতুন রাজনীতির রং লেগেছিল সেখানে বিনায়ক সামন্তের মত সত্যবাদী মানুষের কোন ঠাঁই নেই। রাজনীতিবিদ এবং সাধারণ মানুষ সকলকেই গ্রাস করেছিল নিজের আখের গোছানোর মানসিকতা। পরশুরাম এই স্বার্থবাদী মানসিকতার স্বরূপ উদঘাটন করেছেন একটি কথোপকথনের মধ্য দিয়ে :

''বিনায়ক প্রশ্ন করল দাদা কি বলেন?

দাদা অর্থাৎ আমি বললুম শোন বিনায়ক, এখানে যারা আড্ডা দিচ্ছেন এঁরা সবাই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আর তোমরাও সাধু সজ্জন। তোমার মতন আমি পুরোপুরি সত্য সন্ধ নই, তবুও এই বৈঠকে মনের কথা খুলে বলতে আপত্তি নেই। আমরা হচ্ছি সংসারী লোক, দুনিয়ার সঙ্গে রফা করে চলতে হয়। এই দেখ না, শ্রীযুক্ত সুধা বিন্দু নন্দী বিধান সভায় দাঁড়াচ্ছেন। লোকটি যেমন মাতাল তেমনি লম্পট, দুটো খোরপোশের মামলা এখনও ঝুলছে। কিন্তু ইনি আমার একজন বড় মক্কেল। যদি শোনেন যে আমি তোমাদের সাহায্য করছি তবে আমাকে আর কেস দেবেন না। তারপর মিষ্টার রাধাকান্ত বাসু, লোকসভার ক্যান্ডিডেট। বিখ্যাত চোর আর ঘুষ খোর। কিন্তু তার ছেলের সঙ্গে আমার ছোট মেয়ের বিবাহ স্থির হয়েছে। এখন যদি তোমার কথা রাখি তবে অমন ভালো সম্বন্ধটি ভেস্তে যাবে।

বিনায়ক বলল জেনে শুনে চোর ঘুষ খোরের ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবেন?

—তাতে ক্ষতিটা কি, মেয়ে তো সুখে থাকবে। তাছাড়া আমার বিয়াই মিষ্টার বাসু চোর বলে আমার জামাইও যে চোর হবে এমন কথা সায়েন্স বলে না, আবার দেখ, আমার বড় ছেলেটা কোন গতিকে এম. এ. পাস করে বেকার বসে আছে। আর কমরেডদের পাল্লায় পড়ে বিগরে যাচ্ছে। তার একটা ভালো পোষ্টের জন্যে শ্রী নিবারণী লাল পাচাড়ী চেষ্টা করছেন। আমার বিশিষ্ট

বন্ধু কিন্তু চুটিয়ে কালোবাজার চালান আর পাকিস্থানে চাল আটা তেল কাপড় পাচার করেন। তুমি কি বলতে চাও তাকে চটিয়ে দিয়ে আমার ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করব?''[৮২]

'নিধিরামের নির্বন্ধ' গল্পে নিধিরাম সরকার এরকমই একটি সংশয়বাদী চরিত্র। সে সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান দেশহিতৈষী লোক, কিন্তু অত্যন্ত খুঁত খুঁতে। তিনি স্থির করতে পারেন না — সুরেন বাঁড়ুয্যে না বিপিন পাল, বেঙ্গলি না ইংলিশম্যান—কার উপদেশ ভাল? গান্ধীজী না দেশবন্ধু, নেতাজী না পন্ডিৎজী—কার মতে চলা উচিৎ? কংগ্রেশ, হিন্দু মহাসভা আর সমাজতন্ত্রী দল কোনওটাই তার পছন্দ হয়নি। দেশের হিতার্থে তিনি বক্তৃতা দেননি, ছেলে খেপাননি, ডাকাতি করেননি, সুতা কাটেননি, জেলে যাননি, শুধু মনে মনে মঙ্গলের পথ খুঁজেছেন। অবশেষে নৈরাশ্য আর চিন্তাবিষে জর্জরিত হয়ে দেহত্যাগ করলেন। এরকম সন্দেহাকুল কর্মবিমুখ চরিত্রের প্রতি পরশুরাম বার বার সহানুভূতি মিশ্রিত ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সংশোধন। নিধিরামের প্রতিও তার একই মনোভাব কাজ করেছে। তাই পরলোকে আসার পর বিধাতা নিধিরামকে বলেছে :

> ''তুমি পৃথিবীতে ফিরে যাও, জাতিশ্বর না হলেও তোমার সদিচ্ছার সংস্কার থাকবে। বালক কিশোর আর যুবকদের তুমি সুমন্ত্রণা দিও।
>
> —আমি একটি মন্ত্রণাই জানি—আগে বিনয় ও শিক্ষা তারপর কর্মপথ।
>
> —বেশ তো, ওই মন্ত্রণাই দিও।
>
> —আমার কথায় কেউ যদি কান না দেয় ?
>
> —তোমার চাইতে যারা ঢের বড় অবতার তাঁদের কথাও সকলে শোনেনি। তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রো, তাতেই তোমার জন্ম সার্থক হবে। একবারে কিছু করতে না পারলে বার বার অবতরণ ক'রো। যদি অনন্তকালেও কিছু করতে না পার তা হলেও বিশ্বব্রহ্মান্ডের ক্ষতি হবে না।''[৮৩]

সংশয়বাদী আদর্শবাদকে কেন্দ্র করে পরশুরামের আরও একটি গল্প হল 'অক্রুর **সংবাদ'**। যদিও এ গল্পের প্রতিবেদন নিধিরামের গল্পের থেকে আরও একধাপ এগিয়ে। অক্রুর বিবাহ করেননি। তিনি মনে করেন দাম্পত্য হচ্ছে তিন রকম—এক নম্বর, যাতে স্বামীর বশে স্ত্রী চলে, যেমন গান্ধী-কস্তুরবা। দু নম্বর, যাতে স্বামীই হচ্ছে স্ত্রীর বশ, যেমন জাহাঙ্গীর-নুরজাহান। তিন নম্বর, যাতে স্বামী স্ত্রী কিছু মাত্র রফা না করে নিজের নিজের মত চলে, অর্থাৎ একগুঁয়ে।

অক্রুরবাবু তিন ধরণের দাম্পত্যই পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনটাতেই তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই বিয়ে করাটাও শেষ পর্যন্ত তার হয়ে ওঠে না। গল্পের শেষে এ ধরণের মানসিকতাকে তিরস্কার করা হয়েছে :

''দেখুন অক্রুরবাবু, আপনার ওপর আমার অসীম শ্রদ্ধা রয়েছে। যা বলছি তাতে দোষ নেবেন না। আমি সামান্য লোক, শরীর বা মনের তত্ব কিছুই জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় যে আপনি যে পুং হরমোনের কথা বলছেন তা হরেক রকম আছে—একটাতে দাঁড়ি গজায়, আর একটিতে গুঁতিয়ে দেবার অর্থাৎ আক্রমনের শক্তি আসে, আর একটাতে সরদারী করবার প্রবৃত্তি হয়। তা ছাড়া আরেকটি আছে যা থেকে প্রেমের উৎপত্তি হয়। বোধ হচ্ছে আপনার সেটির কিঞ্চিৎ অভাব আছে। আপনি কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।''[৮৪]

'অক্রুর সংবাদ' গল্পটিকে পরশুরাম আদ্যন্ত একটি হাস্যরসের গল্প করে তুলেছেন। এ হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে মূলতঃ সংলাপের মাধ্যমে । যেমন অক্রুর-এর মন্তব্য :

''আমি বেকার অলস লোক নই, দিনরাত গবেষণা করি কিসে মানুষের বুদ্ধি বাড়বে, সমাজের সংস্কার হবে। কিন্তু মুশকিল কি জানেন? আমি দুশ বৎসর আগে জন্মেছি, এখনকার লোকে আমার থিওরি বুঝতেই পারে না।''[৮৫]

দুধ খায় কিনা জিজ্ঞেস করলে অক্রুর বলে :

''তা খাই, কিন্তু বাছুরকে বঞ্চিত করি না। বাড়িতে তিনটে গরু আছে, বাছুরের জন্য যথেষ্ট দুধ রেখে বাকিটা নিজে খাই।''

মনে রাখতে হবে পরশুরাম তাঁর হাস্যরসের গল্পগুলি নিছক হাস্যরস সৃষ্টি করার জন্যই রচনা করেননি। সবসময়ই সে গল্পগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকেছে একটি সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী। তাই ফিলজফির অধ্যাপক যখন মন্তব্য করে :

''আমার বিদ্যা-বুদ্ধি অতি সামান্য। পুরুত যেমন করে যজমানদের মন্ত্র পড়ায় আমি তেমন করে ছাত্রদের পড়াই। নিজেও কিছু বুঝি না, তারাও কিছু বোঝে না।''[৮৬]

তখন সমসাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থার অসঙ্গতির দিক আমরা স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করতে পারি।

সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত **'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ'** গল্পটিকে উচ্চাঙ্গের স্যাটায়ার বলে অভিহিত করেছেন। গল্পটিকে পরশুরাম যতই 'প্রলাপ' অথবা গল্পকল্প বলে অভিহিত করুন না কেন পরশুরামের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে এতে। সিদ্ধিনাথ রমনীর প্রসাধনকলার

উৎপত্তি রহস্যকে চমৎকারভাবে উদঘাটন করেছেন তাঁর প্রলাপের মধ্য দিয়ে। আজকে যে অলঙ্কার নারীর সৌন্দর্যের আকর হিসেবে চিহ্নিত হয় সেই অলঙ্কার আদিমকালে ছিল বন্ধন নির্যাতনের প্রতীক। আদিমকালে যখন গৃহিণী সহজলভ্য ছিল না, তখন তাকে পোষ মানাতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল পুরুষকে। সিদ্ধিনাথ বর্ণনা করেছেন, পুরুষের তারা খেয়ে :

> ''মেয়েটা মুখ থুবড়ে পড়ল, কপাল ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। তারপর তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে লোকটা নিজের আস্তনায় এল এবং নাকে বেতের আংটি পরিয়ে তাতে দড়ি লাগিয়ে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেললে। এই রকম আষ্টেপৃষ্টে বন্ধনের পর ক্রমে ক্রমে মেয়েটা পোষ মানল, স্বামীর ওপর ভালোবাসাও হল। অল্পকালের মধ্যেই সকল মেয়ের ধারণা হল যে নির্যাতনের চিহ্নই হচ্ছে অলঙ্কার আর সৌভাগ্যবতীর লক্ষণ।''[৮৭]

এখনকার প্রসাধনের রীতি আর গহনার ছাঁদেও রয়েছে সেই বর্বতার ছাপ। আজ যা সিঁদুর তা ছিল কপালের রক্ত, আলতা ছিল পায়ের রক্ত। পুর্বে যা বউ বাঁধবার আংটা, কড়া আর বেরি ছিল, আজ তা নথ মাকড়ি হার বালা ও মল হিসেবে অভিনন্দিত হয়। সিদ্ধিনাথ তার এই প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে পুরুষ জাতীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করলেও ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু নারীর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। এই বৈপরীত্যই গল্পটিকে সরস করে তুলেছে।

(৫) অতিপ্রাকৃত ও ভৌতিক গল্প :

পরশুরামের এমন কতগুলি গল্প আছে যেগুলি রচিত হয়েছে উদ্ভট ও অপ্রাকৃত পরিবেশকে অবলম্বন করে। এই গল্পগুলি হল 'মহেশের মহাযাত্রা', 'ভূশন্ডীর মাঠে', 'বদন চৌধুরীর শোকসভা', 'জটাধর বক্সী', 'শিবামুখী চিমটে' প্রভৃতি। এই গল্পগুলির কোনটিতে লেখক ভূতপ্রেতের নানা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপকে অবলম্বন করেছেন, আবার কোনটিতে উদ্ভট কাহিনি গল্প বিষয়ে যুক্ত করেছেন। এ গল্পগুলি প্রসঙ্গে ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন :

> '' লেখকের উর্বর উদ্ভাবনী শক্তি হইতে এমন আত্যন্তিক উদ্ভট ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছে যেগুলি আমাদের বুদ্ধি ও বিশ্বাসের উপর অতর্কিত রূঢ় আঘাত হানিয়া আমাদের অদম্য কৌতুকবৃত্তিকে অকস্মাৎ উত্তজিত করিয়া তোলে।''[৮৮]

—এ গল্পগুলির মধ্যে অদ্ভুত ও অপ্রাকৃত জগৎকে পাশাপাশি রেখে কৌতুকের আবহ নির্মাণ করেছেন লেখক।

আসলে পরশুরাম লক্ষ করেছেন নানা অলৌকিক সংস্কার জাতির জীবনে কীভাবে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। এই অলৌকিক বিশ্বাসের সূত্র ধরেই মানুষের মনে বাসা বেধেছে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস ও সাধু সন্ন্যাসীর উপর অন্ধ ভক্তি। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় এই অলৌকিক সংস্কার কোথাও মানুষের উপর মানুষেরই অত্যাচারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও তা হয়েছে অর্থ উপার্জনের অস্ত্র। মোদ্দাকথা যুগযুগ ধরে এই অলৌকিক সংস্কার জাতির উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'জাতি চরিত্র' প্রবন্ধে তাই রাজশেখর বলেন :

> '' আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি বলে গর্ব করি, কিন্তু আমাদের ধর্মের অর্থ প্রধানত বাহ্য অনুষ্ঠান, নানা রকম অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস এবং ভক্তির চর্চা। অর্থাৎ পুরোহিত মারফত পূজা, কবচ-মাদুলি, আর যদি ভক্তি থাকে তবে ইষ্ট দেবতার আরাধনা।...নেপালবাবার দৈব ঔষধের লোভে অসংখ্য লোকের কষ্টভোগ আর কুম্ভ-স্নান পুণ্যের দুর্বার আকর্ষণে বহু লোকের প্রাণহাণি এই মোহের ফল।''[৮৯]

শুধু অশিক্ষিত মানুষ নয় শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও এই অলৌকিক সংস্কার সমানভাবে বাসা বেধে আছে। এই অলৌকিক সংস্কার ত্যাগ না করলে জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির। পরশুরাম বিশ্বাস করেন :

> ''জগতের শিক্ষিত জন যদি সকল ক্ষেত্রে এই প্রকার উদার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে শেখেন তবে কেবল সাধারণ ভ্রান্ত সংস্কার দূর হবে না, ধর্মান্ধতা ও রাজনীতিক সংঘর্ষেরও অবসান হবে।''[৯০]

এই মানসিকতা থেকেই পরশুরাম মানুষের অন্ধ বিশ্বাসকে ও অলৌকিক সংস্কারকে ব্যঙ্গ করেছেন তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে।

এই শ্রেণির গল্পগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় **'ভূশন্ডীর মাঠে'** গল্পটির কথা। 'ভূশন্ডীর মাঠে' গল্পে পরশুরাম যে অলৌকিক ভূতুড়ে কাহিনি নির্মান করেছেন। ভূশন্ডীর মাঠে তিনটি প্রেতাত্মার সমাবেশ ঘটেছে। এই তিনটি প্রেতাত্মা হল—শিবু ভট্টাচার্য, কারিয়া পিরেত ও নদেরচাঁদ মল্লিক। এরা ব্রম্মদৈত্য, কেলেভূত ও যক্ষ রূপে যথাক্রমে বেলগাছ, তাল গাছ ও ইঁটের পাঁজরার নীচে সূক্ষ্ম শরীরে বাসা বেঁধেছে। পার্থিব জীবনে এদের কারোরই পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। শিবুর স্ত্রী নৃত্যকালী ছিল অত্যন্ত মুখরা, সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া লেগেই থাকত। কারিয়া পিরেতের স্ত্রী মুংরি অত্যন্ত মুখরা ও বদমেজাজী, তাদের মধ্যে বনিবনা কখনই হত না। আর নদেরচাঁদের গিন্নী ছিল অত্যন্ত খান্ডার প্রকৃতির। পারিবারিক জীবনের চরম অশান্তিই তাদেরকে অকালে ইহলোক ছাড়তে বাধ্য করেছিল। এদের অতৃপ্ত আত্মাই এখন এসে আশ্রয় নিয়েছে ভূশন্ডীর মাঠে। এই তিনটি প্রেতাত্মা ছাড়াও ভূশন্ডীর

মাঠে আশ্রয় নিয়েছে আরো তিনটি প্রেতাত্মা—এরা হল পেত্নী, শাঁকচুন্নী ও ডাকিনী। এদের তিনজনকেই ব্রম্মদৈত্যরূপী শিবুর মনে ধরেছে। তবে এদের মধ্যে ডাকিনীটিকেই তার সবথেকে পছন্দ। ভৌতিক পদ্ধতিতে তাদের মধ্যে বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। বিবাহের পর ডাকিনী ঘোমটা সরাতেই শিবু হতভম্ব হয়ে যায় :

''অ্যা! তুমি নেত্য''—

জবাব এল—''হ্যাঁরে মিন্‌সে। মনে করেছিল ম'রে আমার কবল থেকে বাঁচবে। পেত্নী শাঁক চুন্নীর পিছু পিছু ঘুরতে বড় মজা, না?''

ইতিমধ্যে পেত্নী শাঁকচুন্নীও এল। স্বামীত্বের দাবী নিয়ে তাদের মধ্যে শুরু হল তীব্র গোলযোগ ও বাদানুবাদ—

''পেত্নী। আমার সোয়ামী তোকে কেন দেব লা?

শাঁকচুন্নী। আ মড় বুড়ি, ও যে তোর নাতির বয়সী।

পেত্নী। আহা কি আমার কনে বউগা!

শাঁকচুন্নী। দূর মেছো পত্নী, আমি যে ওর দু জন্ম আগেকার বউ।

পেত্নী। দূর গোবরচুন্নী, আমি যে ওর তিন জন্ম আগেকার বউ।''

শাঁকচুন্নী। মর চেঁচিয়ে, ওদিকে ডাইনি মাগী মিন্‌সেকে নিয়ে উধাও হ'ক।

তখন পেত্নী বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া আগড় বন্ধ করিয়া বলিল—'আগে তোর ঘাড় মটকাব তারপর ডাইনি বেটিকে খাব।'

কামড়া কামড়ি চুলচুলি আরম্ভ হইল। একা নৃত্য কালীতেই রক্ষা নাই তাহার উপর পূর্বতন দুই জন্মের আরও দুই পত্নী হাজির। শিবু হাতে পইতা জরাইয়া ইষ্টমন্ত্র যপিতে লাগিল।''[৯১]

—নৃত্যকালীরও তিন জন্মের তিন স্বামী হাজির। যক্ষ তাকে দেখেই বললেন—''এ কি, গিন্নী! এখানে? বেম্মদত্যিটার সঙ্গে! ছি! ছি!—লজ্জার মাথা খেয়েছ?'' ডাকিনী ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

কারিয়া পিরেত বলিল—'আরে মুংরি, তোহর শরম নাহি বা?'[৯২]

শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্য কালীর তিনজন স্বামীর ডবল ত্র্যহস্পর্শযোগে ভূশন্ডীর মাঠ জমে উঠল।

'ভূশন্ডীর মাঠে' গল্পে যে ভৌতিক জগতের চিত্র পরশুরাম আমাদের উপহার দিয়েছেন তা আমাদের এক অনাবিল হাস্যরসের জগতে নিয়ে যায়। ভূতদের ক্রিয়াকলাপে, কথাবার্তায়, মানবিক আচরণ যুক্ত করে পরশুরাম যে হাস্যরসের জগৎ গড়ে তুলেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করলেও এই ভূতেরা তামাক খায়, গঙ্গা স্নান করে, প্রেত সুলভ নাকি সুরে গান বাজনা করে এমনকি খেজুরের ডাল দিয়ে রোয়াক ঝাঁট দেয়। শুধু তাই নয় প্রেম ভালোবাসাও তাদের মধ্যে উপস্থিত। তাদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তাগুলি মানবিক আচরণে পরিপূর্ণ যা যথেষ্ট কৌতুককর। আর এর মধ্যে পরশুরাম মানুষের দাম্পত্য জীবনের অর্থহীন কলহকে কটাক্ষ করেছেন।

ভূতপ্রেতে বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে পরশুরামের একটি মহৎ সৃষ্টি **'মহেশের মহাযাত্রা'** গল্পটি। অঙ্কের অধ্যাপক মহেশ মিত্তির, ফিলসফির অধ্যাপক হরিনাথ কুন্ডু। তারা দুজনে অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেও ভূত, প্রেতের ব্যাপারে তারা ভিন্ন মত পোষণ করতেন। মহেশ মিত্তির ভূত প্রেতে বিশ্বাস করতেন না কিন্তু হরিনাথ কুন্ডুর ভূত প্রেতে ছিল অগাধ বিশ্বাস। এই বিষয়ে দুজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক লেগেই থাকত। মহেশ মিত্তির অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিলেন যে ভূত-প্রেত বলে কোন বস্তু পৃথিবীতে নেই। কিন্তু হরিনাথ কুন্ডু তার বিশ্বাসে অনড়। তার বিশ্বসের প্রমাণ দেওয়ার জন্য এক শিব চতুর্দশীর রাত্রিতে রাত বারোটায় মানিকতলার শ্মশানে মহেশকে নিয়ে গেলেন। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে :

> ''হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল, যেন কোন অশরীরী বেড়াল তার পলাতকা প্রণয়ণীকে আকুল আহ্বান করছে। একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন, একটা লম্বা রোগা কুচকুচে কাল মূর্তি দু-হাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটু দূরে ঐরকম আরও দুটো।
>
> হরিনাথবাবু থরথর করে কাপতে কাঁপতে বললেন—'রাম রাম সীতারাম। ও মহেশ, দেখছ কি, তুমিও বল না।'

আর একটু হলেই মহেশবাবু রামনাথ উচ্চারণ করে ফেলতেন, কিন্তু তার কনসেন্স বাধা দিয়ে বলল : 'উঁহু, একটু সবুর কর, যদি ঘার মটকাবার লক্ষ্মণ দেখ তখন না হয় রাম নাম করা যাবে।'

এঁরা একটা পাকুড় গাছের নীচে ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা কাদা গোলা জল মহেশের মাথায় এসে পড়ল।

তখন সামনের সেই কালো মূর্তিটা নাকী সুরে বললে—'মহেশবাবু আপনি নাকি ভূত মানেন না?

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বলে থাকেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, মানি বই কি। কিন্তু মহেশ মিত্তির বেয়াড়া লোক, হঠাৎ তাঁর কেমন একটা খেয়াল হল, ধাঁ করে এগিয়ে গিয়ে ভূঁতের কাঁধ খামচে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন 'কোন ক্লাস ?'

ভূত থতমত খেয়ে জবাব দিলে—'সেকেন্ড ইয়ার সার!'

রোল নম্বর কত?'

ভূত করুণ নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—'বলি সার ?'

হরিনাথের মুখে রাম নাম ভিন্ন কথা নেই। পিছনের দুটো ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকুড় গাছে যে ছিল সে টুপ করে নেমে এসে পালিয়ে গেল। তখন বেগতিক দেখে সামনের ভূতটি ঝাঁকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় মারলে।'' [৯৩]

—এরপর ভূতের অনস্তিত্ব সম্পর্কে মহেশ মিত্তিরের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। সেই বিশ্বাস নিয়েই তিনি মারা গেলেন। তাঁর শ্মশানযাত্রী হরিনাথ দেখতে পেলেন ছুটন্ত শব বহনকারী খাটিয়ার উপর মৃত মহেশ খাঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। হরিনাথের কানে ধ্বনিত হতে থাকল মহেশের চিৎকার, 'ও হরিনাথ আছে, আছে সব আছে, সব সত্যি—'[৯৪]

আসলে যুক্তিবাদী মন যতই সগৌরবে ভূতের অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাক আমাদের অন্তরে যে একটি সংশয়বাদী মন রয়েছে তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। যুগ যুগ ধরে মানুষ এই সংস্কারবাদী মনের দাস। তাই জীবিত মহেশ যা বিশ্বাস করেন নি মৃত মহেশ তাই ঘোষণা করে গেলেন।

অতিপ্রাকৃতের আভাসযুক্ত আরেকটি গল্প **'বদন চৌধুরীর শোকসভা'**। ভৌতিক ব্যাপার গল্পটিতে থাকলেও গল্পটিকে ভূতের গল্প বলা যায় না। সমাজের দুর্নীতিপরায়ণ মানুষকে ব্যঙ্গ করাই এ গল্পের উদ্দেশ্য। বদন চৌধুরীর মৃত্যুর পর তার অনুরাগীরা যে শোকসভার আয়োজন করেছে তা নিজে চোখে দেখবার জন্য বদন চৌধুরীর প্রেতাত্মা তার সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে যমরাজের অনুমতি নিয়ে সেই সভায় এলেন। তার পেছনে পেছনে একইভাবে সেখানে এলেন তার পুরানো

শত্রু মৃত ঘনশ্যাম। দুজনেরই নরকে ঠাঁই হয়েছে। সে সভার সকলেই নিজেদের বক্তৃতায় বদন চৌধুরীকে একজন মহাপুরুষ হিসেবে অভিহিত করলেন। বদন চৌধুরীকে নিয়ে এই প্রশস্তি ঘনশ্যামের সহ্য হল না। কেননা তিনি বদনচৌধুরীর সমস্ত কুকীর্তি জানেন। তার সূক্ষ্ম শরীর তাই প্রধান বক্তা গোবর্ধন বাবুর মরমে প্রবেশ করে বদনচৌধুরীর সমস্ত কুকীর্তি প্রকাশ করে দিলেন। বদন চৌধুরীও চুপ করে থাকলেন না। তিনি সভাপতি অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর শরীরে ভড় করলেন এবং ঘনশ্যামকে এক হাত নিলেন।

(৬) রোমান্স-রসিকতাপূর্ণ গল্প :

পরশুরামের এমন কিছু গল্প রয়েছে যেগুলি প্রেমের স্পর্শযুক্ত। তবে হাসি এখানেও উপস্থিত। পরশুরামের বিশেষ কৃতিত্ব এ গল্পগুলিতে ধরা পড়েছে। সাধারণভাবে যিনি হাসির গল্প লেখক তিনি প্রেম থেকে একটু দূরেই অবস্থান করেন। এর কারণ সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন প্রমনাথ বিশী :

''ব্যঙ্গ লেখকের কলমের সঙ্গে প্রেমের বড় আড়াআড়ি, দুয়ে মেলে না, কিংবা মিলতে গেলেও তীক্ষ্ণ কলমের ঠোকরে প্রেমে বিকৃতি ঘটে যায়। সুইফট, বার্ণাড শ ও ভলটেয়ার মহা প্রতিভাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও মধুর রসের কাহিনি লিখতে পারেননি। এমন কেন হয় সহজেই অনুমেয়। ব্যঙ্গের চোখ স্বভাবতই জীবনের অপূর্ণতার দিকে নিবদ্ধ আর প্রেমে যেমন জীবনের পূর্ণতার পরিচয় এমন আর কিসে? ও দুয়ে ধর্মের মূলগত প্রভেদ। অন্য পক্ষে লিরিক কবি, প্রেম যাদের প্রধান উপজীব্য তাদের হাতের ব্যঙ্গের কলমের গতি বড় সুষ্ঠু নয়। শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ এর উদাহরণ। ব্যতিক্রম বায়রণ ও হায়নে। কীটস সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না, কাব্যের কোন ক্ষেত্রে তার প্রবেশ অনধিকার ছিল এমন মনে হয় না।''[৯৫]

পরশুরামও তাঁর মহৎ প্রতিভার দ্বারা অদ্ভুতভাবে তাঁর ব্যঙ্গ দৃষ্টির সঙ্গে প্রেমকে যুক্ত করতে পেরেছেন। রোমান্সের রঙ্গিন চশমায় এ গল্পগুলি নর-নারীর প্রেমে রঙ্গিন হয়ে ওঠেনি। পরশুরামের বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনায় আধুনিক প্রেমের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে এ গল্পগুলিতে। 'পুনর্মিলন', 'উপেক্ষিতা', 'প্রেমচক্র', 'নীলতারা','তিলোত্তমা', 'তিরি চৌধুরী', 'দ্বান্দ্বিক কবিতা', 'আনন্দীবাঈ', 'রাজ মহিষী', 'চিঠি বাজী', 'যশোমতী', 'জয়হরির জেব্রা' প্রভৃতি গল্প এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

আধুনিককালে রোমান্স যে কত সাজানো ব্যাপার তা স্পষ্ট হয়েছে **'উপেক্ষিতা'** গল্পটিতে। নায়িকা গরিমা গাঙ্গুলি ও নায়ক চটক রায় এক বর্ষণমুখর রাত্রিতে পাশাপাশি বসে আছে। গরিমার বাবা মা চায় গরিমার সঙ্গে চটক রায়ের বিবাহ দিতে। গরিমা সেই উদ্দেশ্যেই

চটক রায়ের মন পেতে মরিয়া। সে একের পর এক গান গেয়ে নায়ককে সন্তুষ্ট করতে চায়। কিন্তু নায়ক ওঠার জন্য ছটফট করতে থাকে। গরিমা আরও কিছুক্ষণ তার সঙ্গ পেতে চায়। নায়কের অস্থিরতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। একসময় জোর করেই সে চলে যায়। এতে গরিমা প্রচন্ড দুঃখ পায়। নারী জীবনকে ব্যর্থ মনে করে প্রবল হতাশায় চটকের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে দেহ এলিয়ে দেয় ঃ ''তাহার পরেই এক লাফ। ভীষণ সত্য সহসা প্রকট হইল। বেচারা চটক! চেয়ারে অগণতি ছাড়পোকা।''[৯৬]

'পরশ পাথর' গল্পে আমরা মেকি রোমান্সের আরেকটি রূপের পরিচয় হিন্দোলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। হিন্দোলা তার প্রেমিক প্রিয়তোষের থেকে অনেক ভালোপাত্র গুঞ্জন ঘোষের সন্ধান পেয়ে অবলীলায় প্রিয়তোষকে বিদায়ী চিঠি লিখে জানিয়েছে :

> ''গুঞ্জন ঘোষের নাম শুনেছ? চমৎকার গায়, সুন্দর চেহারা, কোঁকড়া চুল। সিভিল সাপ্লাইয়ে ছ-শ টাকা মাইনে পায়, বাপের একমাত্র ছেলে, বাপ কন্ট্রাকটারী করে নাকি কোটি টাকা করেছে। সেই গুঞ্জনের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। দুঃখ করো না, লক্ষ্মীটি।...প্রিয় ডারলিং এই আমার শেষ প্রেমপত্র, কাল থেকে তুমি আমার ভাই। আমি তোমার স্নেহময়ী দিদি। ইতি। আজ পর্যন্ত তোমারই হিন্দোলা।''[৯৭]

আবার এই হিন্দোলাই যখন প্রিয়তোষের কাছে পরশপাথর থাকার কথা জেনেছে তখন ফিরে এসে বরমাল্য দিয়েছে এই প্রিয়োতোষকেই। পরশ পাথর প্রিয়তোষের পেটে ছিল ঠিকই কিন্তু একমাসের মধ্যে প্রিয়তোষ সেই পরশ পাথরকে জীর্ণ করে ফেলেছে। বলা বাহুল্য এই ঘটনায় সব থেকে যে বেশি দুঃখ পেয়েছে তিনি হলেন হিন্দোলা। তার বাবাও ভীষণ চটে গেছেন।

'ভূশন্ডীর মাঠে' গল্পে শিবুর তিন জন্মের স্ত্রী এবং নৃত্য কালীর তিনজন স্বামীর উপস্থিতিতে যে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে **'প্রেমচক্র'** গল্পেও তিনজন প্রেমিক-প্রেমিকাকে কেন্দ্র করে প্রেমের আরেকটি জটিল রূপ পাই। পাত্র তিন ঋষি কুমার—হারিত, জারিত আর লালিত। পাত্রী—তিন ঋষিকন্যা সমিতা, জমিতা আর তমিতা। হারিত ভলোবাসে সমিতাকে, কিন্তু সমিতা চায় জারিতকে। আবার জারিত চায় জমিতাকে, অথচ জমিতার টান লারিতের ওপর। আবার লারিত ভলোবাসে তমিতাকে, কিন্তু তমিতার হৃদয় হারিতের প্রতি অনুরক্ত। এরফলে সৃষ্টি হয় ভারী গোলমেলে পরিস্থিতির। কোন প্রেমই শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা পায় না।

নারীর যে সম্মোহিনী শক্তি পুরুষকে চিরকাল মোহাবিষ্ট করে রেখেছে তা যে কতটা নিরর্থক **'তিলোত্তমা'** গল্পে তা উদঘাটন করেছেন পরশুরাম। এ গল্পে সিদ্ধিনাথ যার প্রেমে পড়েছিল সে যে-সে নারী নয়, বোম্বাই ফিল্ম জগতের নায়িকা। তিলোত্তমার সুন্দর চেহারা, বাচনভঙ্গী, সংস্কৃতিবোধ সবই সিদ্ধিনাথকে তিলোত্তমার প্রতি মোহাবিষ্ট করেছে। কিন্তু সিদ্ধিনাথের শিক্ষক রাম দাস একে একে সেই তিলোত্তমার আবরণ ও আভরণ উন্মোচন করে সিদ্ধিনাথকে প্রকৃত বাস্তব সম্পর্কে অভিহিত করালেন :

> ''তোমার তিলোত্তমা অর্ধেক নয়, পনেরো আনা কল্পনা। তুমি আর কতটুকু জান হে ছোকড়া? তার মূর্তিটা জোরাতালি দিয়ে তৈরী, তার ভাষা নিজের নয়, নাট্যকারের; তার গানও নিজের নয়, অন্য মেয়ে আড়াল থেকে গেয়েছে। একটা কৃত্তিম মানবীর চিত্রার্পিতা ছায়া দেখে তুমি ভুলেছ। তার মেজাজ তুমি জান না। হয়তো দেমাকে মটমট করছে, হয়তো তার কালচারও বিশেষ কিছু নেই।''[৯৮]

—এ প্রসঙ্গে রামদাস সেকালে কলকাতার একজন অতি সৌখীন বনেদী বড়লোক প্রেমিকের উল্লেখ করেছেন যিনি দুদিন তার প্রেয়সীর সঙ্গে দেখা না করতে পেরে তৃতীয় দিন ভোর বেলায় হঠাৎ করেই তার বাড়িতে হাজির হলেন এবং যা দেখলেন তা সিদ্ধিনাথের মোহ মুক্তির ঘটানোর জন্য যথেষ্ট : ''দেখলেন, তার প্রেয়সী গামছা পরে গাড়ু হাতে কোথায় চলেছেন।'' এই নিরাবরণ দৃশ্য আর যাই হোক না কেন তা কোন মোহের সঞ্চার করে না। প্রেয়সীর সেই অদৃষ্টপূর্ব প্রাকৃত রূপ দেখে ভদ্রলোকের মোহ কেটে গেল। তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করলেন। মোহমুক্তি ঘটল সিদ্ধিনাথেরও।

'চিঠিবাজী' গল্পে বিবাহের পূর্বেই ভাবী নববধূর চিঠি আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে রোমান্স সৃষ্টি হয়েছে। উভয়েরই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরের কাছে নিজেদের সততাকে তুলে ধরা এবং পরস্পরকে বাজিয়ে নেওয়া। তাদের প্রথম চিঠি দুটি থেকে একথা পরিষ্কার। সুকান্ত দত্ত তার ভাবী নববধূ সুনন্দার উদ্দেশ্যে প্রথম চিঠিতে লিখেছে :

> ''শ্রীযুক্ত সুনন্দ ঘোষ সমীপে। আমার সঙ্গে আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। মামাবাবুর চিঠিতে জানলুম আপনি খুব ফরসা। আমার রঙ কিন্তু খুব ময়লা। হয়তো আপনি শুনেছেন শ্যামবর্ণ, কিন্তু তাতে অনেক রকম শেড বোঝায়। আমার গায়ের রঙ ঠিক কি রকম তা আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করি, সেজন্য এক টুকরো কাগজে রঙ লাগিয়ে পাঠাচ্ছি, আমার বা হাতের কবজির উপর পিঠের সঙ্গে

মিল আছে। এই রকম গাঢ় শ্যাম বর্ণ স্বামীতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে তবে দয়া করে এক লাইন লিখবেন—আপত্তি নেই। আমার ঠিকানা লেখা খাম পাঠালাম। যদি আপত্তি থাকে তবে চিঠি লেখবার দরকার নেই। পাঁচ দিনের মধ্যে আপনার উত্তর না পেলে বুঝব আপনি নারাজ। সে ক্ষেত্রে আমি মামাবাবুকে জানাব যে এই সম্বন্ধ আপনার পছন্দ নয়, অন্য পাত্রী দেখা হোক। ইতি। সুকান্ত।''[৯৯]

সুনন্দা চার দিনের মধ্যে উত্তর পাঠিয়েছে :

''ডঃ সুকান্ত দত্ত সমীপে। আপত্তি নেই। কিন্তু প্রকৃত খবর আপনি পাননি, আমার গায়ের রঙ আপনার চাইতে ময়লা, কনে দেখাবার সময় আমাকে পেন্ট করে আপনার মামাবাবুকে ঠকানো হয়েছিল। কিন্তু আপনার মতো সত্যবাদী ভদ্রলোককে আমি ঠকাতে চাই না। আমার কাছে ছবি আঁকবার রঙ নেই। আপনি যে নমুনা পাঠিয়েছেন সেই কাগজ থেকে এক টুকরো কেটে তার উপর একটু ব্লু ব্ল্যাক কালি লাগিয়ে আমার হাতের রঙের সমান করে পাঠালুম।''[১০০]

গল্পটির কৌতুকরস জমে উঠেছে সুনন্দার শেষ চিঠিতে যেখানে সে উল্লেখ করেছে যে এ বিয়ে হচ্ছে না কারণ তার পুর্ব প্রেমিক পবন ভাদুড়ীকেই সে বিবাহ করছে। অবশ্য নিজের বোন নন্দাকে বিয়ে করার জন্য সে সুকুমারবাবুকে প্রস্তাব দিয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি মত যথা দিনে সুকুমার বিয়ে করতে হাজির। মনে মনে সে প্রস্তুত সুনন্দার বোন নন্দাকে বিয়ে করতে। আকস্মিকভাবেই একটি ঘটনায় প্রকৃত সত্য বুঝে নিয়েছে সুকান্ত। আসলে নন্দা বলে কারো অস্তিত্বই নেই। তাই নন্দা নয় সুনন্দাকেই সে বিবাহ করতে চলেছে। বাসর ঘরে সুনন্দা জানিয়েছে এতসব মিছে কথার পিছনে : ''কোনও কুমতলব ছিল না, সত্যবাদী উচ্চকিত ভাবী বরকে একটু বাজিয়ে দেখছিলুম। সইবার শক্তি কতটা আছে।''[১০১]

রোমান্সের লীলা বৈচিত্র্যের একটি বিশেষ দিক তুলে ধরা হয়েছে **'যশোমতী'** গল্পে। কৈশোরের যে প্রেম যৌবনে পরিপূর্ণতা লাভ করেনি সে প্রেমের স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে বার্ধক্যে এসে। অল্প বয়সে যশোমতীর বিবাহ হয়ে যাবার পর পুরঞ্জয়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পর। ততদিনে উভয়েই বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। এই সুদীর্ঘকাল যশোমতীর জীবনে ঘটে গেছে নানা উত্থান পতন। পুরঞ্জয়ও বিবাহ করেননি। অস্তাচলের তীরে এসে হঠাৎই একে অপরকে কাছে পেয়ে তারা আত্মহারা হয়ে গেছে। অবশ্য যশোমতীর পৌত্র ধ্রুব এবং নাতবৌ রাকা এই আত্মহারা হয়ে যাওয়ার পথকে সুগম করে তুলেছে।

‘তিরি চৌধুরী’ গল্পটি অনেকটা রোমান্টিক কমেডি ধাচের। ‘যশোমতী’ গল্পে প্রেমিক প্রেমিকা মাঝখানের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে আবার মুখোমুখি হয়েছিল আর ‘তিরি চৌধুরী’ গল্পে ‘মাইট হ্যাভ বিন্ বা হইলেও হইতে পারিত’ পাত্র-পাত্রীরা বৃদ্ধ বয়সে এসে এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। এখানে মধ্যস্থতা করেছে তিরি চৌধুরী। তিরি কৌশলে তার বর্তমান ঠাকুমার সঙ্গে অল্পের জন্য বিবাহ না হওয়া বা ‘মাইট-হ্যাভ-বিন’ ঠাকুদ্দা গৌরগোপালবাবু এবং বর্তমান ঠাকুদ্দার সঙ্গে অল্পের জন্য বিবাহ না হওয়া বা ‘মাইট-হ্যাভ-বিন’ ঠাকুমা প্রভাবতি দেবীকে একজায়গায় মুখোমুখি এনে বসিয়েছে। তিরি ‘হতে-হতে-ফসকে-যাওয়া’ ঠাকুর্মা চিরকুমারী প্রভাবতী দেবী এবং ‘হতে-হতে-ফসকে-যাওয়া’ ঠাকুর্দা নবকুমার গৌরগোপালবাবুর কোর্টশিপেরও একটি কৌতুককর ইঙ্গিত দিয়েছে সে।

এ গল্পটি প্রেমের গল্প নয় তবু প্রেমের স্বাভাবিক লক্ষ্মণ ঈর্ষার প্রকাশ ঘটেছে তিরি চৌধুরীর ঠাকুর্মা বৃদ্ধা কনকলতার মধ্যে যা গল্পটিতে অনাবিল হাস্যরসের যোগান দিয়েছে। যেমন তিরি প্রভাবতীর রূপের প্রশংসা করলে :

> ‘‘কনকলতা চেঁচিয়ে বললেন, শাঁকচুন্নী বাবা, একেবারে শাঁকচুন্নী!
>
> করুণাময় হেসে বললেন, তবে আপনার ভাবনা কিসের?
>
> —ও জজ সায়েব, তা বুঝি জান না? ডাকিনী যোগিনী শাঁকচুন্নীদের বলে কত ছলা কলা, পুরুষকে ভেরা বানিয়ে দেয়। আর এই তিরির ঠাকুর্দাটিও বড্ড হাবা গোবা, শুধু কপাল গুণেই টাকা রোজগার করে, নইলে বুদ্ধি কি আর কিছু আছে? ছাই, ছাই। তুমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে বুড়োকে ওই ডাকিনীর হাত থেকে উদ্ধার কর বাবা।’’[১০২]

এরকম রসিকতাপূর্ণ অজস্র সংলাপে পরিপূর্ণ এ গল্প যা গল্পটিকে নির্ভেজাল হাস্যরসের গল্প করে তুলেছে।

‘ধুস্তুরী মায়া’ দুই বুড়োর রূপকথা হলেও আধুনিক যুগের মেকী প্রেমকে এ গল্পে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ব্যঙ্গমা-বেঙ্গমীর শেখানো মন্ত্রে বৃদ্ধ উদ্ভব পাল তার হারানো যৌবন ফিরে পেয়ে প্রাপ্ত যৌবনকে সার্থক করতে সচেষ্ট হয়। পাত্রী স্পন্দছন্দা চৌধুরাণী। উদ্ভব ও স্পন্দছন্দার সর্ব বিষয়েই বৈসাদৃশ্য। পাত্রের অনেক টাকা কিন্তু চলনবলন একেবারেই সেকেলে। আর পাত্রী স্পন্দছন্দা নামে যেমন আধুনিকা তেমনি আচারে ব্যবহারে সে আধুনিক। কিন্তু আসলে সবই শূন্যগর্ভ। পাত্র ফোর পাস হলেও মেকী পাত্রীকে চিনে নিতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি। পাত্রী নিজে মুখে তার বয়স বাইশ বললেও তা যে কোনভাবেই বত্রিশের কম নয় তাও তিনি পাত্রীর মুখের উপর বলে দেন। পাত্রীর সম্পদের বড়াই যতই থাক তা যে শূন্যগর্ভ আস্ফালন ছাড়া

আর কিছুই নয় তাও তার বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না । উদ্ভব জীবনে প্রচুর উপার্জন করেছেন, স্ত্রীর সেবাযত্নে সুখে স্বাচ্ছন্দে দিন কাটিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক কালের ফ্যাসানদুরস্ত প্রেমের আদান প্রদান দেখে মনে মনে আক্ষেপ করেছেন। স্পন্দছন্দার সান্নিধ্যে এই আক্ষেপ মেটানোর সুযোগ যখন তার কাছে হাজির হয়েছে তখন তিনি অনুভব করেছেন যে তার গদ্য ময় দাম্পত্য জীবনের কাছে এই আধুনিক প্রেম একেবারেই মেকি : ''তরমুজের কাছে তেলাকুচা, কামধেনুর কাছে মেনী বেড়াল।''[১০৩] তাই তিনি আবার তার পুরানো জীবনে ফিরে গেলেন।

'স্বয়ম্বরা' গল্পে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারবদ্ধ জীবনধারার সঙ্গে আধুনিক সংস্কারমুক্ত ধনতান্ত্রিক যন্ত্রযুগের রোমান্সের একটি তুলনামূলক ব্যঙ্গচিত্র। একদিকে রয়েছে কেদার চাটুয্যে, অন্য দিকে দুই আমেরিকান পুরুষ টিমথি টোপার ও ক্রিষ্টোফার কলম্বাস ব্লটো এবং তাদের একটি মাত্র প্রণয়ণী জোন জিলটার। দু জনেই প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক। এবং পাঁড় মাতাল। এরা দুজনেই জোনকে বিবাহ করতে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরমে পৌঁছায় ট্রেনের কামড়ায় যেখানে কেদার চাটুয্যেও একজন যাত্রী। ট্রেনের মধ্যেই তারা মারামারি শুরু করলে জোন বৃদ্ধ কেদার চাটুয্যের কাছে সঠিক পাত্র নির্বাচনের জন্য সিদ্ধান্ত চায়। ইতিমধ্যে দুজনের মারামারি বন্ধ করতে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা বিল পাউন্ডার আসরে অবতীর্ণ হন। চাটুয্যে জোনকে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি দেন ওই দুজনকে ছেড়ে বিলকেই বিবাহ করতে। চাটুয্যের আশীর্বাদ দানের মধ্য দিয়েই ওদের বিবাহের প্রথম এনগেজমেন্টটা সম্পন্ন হয় এবং তিনদিন পরে গ্র্যান্ড হোটেলে চূড়ান্ত বিবাহের দিন চাটুয্যেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। চাটুয্যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েও ছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন, বিয়ের পরদিনই বেটী পালিয়েছে। সায়েব তাকে খুঁজতে গিয়েছে।

আসলে যে বিবাহ বন্ধনকে ভরতবর্ষে চিরন্তন, দেবতার আশীর্বাদপূত অচ্ছেদ্য সম্পর্ক হিসেবে দেখা হয় পাশ্চাত্য সভ্যতায় তা যৌবনের বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সতীত্বের আদর্শ, ধর্মীয় অনুশাসন সেখানে অবান্তর। এই বিবাহের ক্ষণিকতা, অন্তঃসারশূন্যতাকে পরশুরাম তীব্র কটাক্ষ করেছেন আলোচ্য গল্পে।

'আনন্দীবাঈ' ছোটগল্পটি ব্যঙ্গরসিক পরশুরামের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। পুরুষের বহু নারী-সঙ্গ লাভের ইচ্ছাকে একদিকে যেমন বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে এ গল্পে তুলে ধরা হয়েছে অন্য দিকে ধর্মজ্ঞানহীনা, উচ্চভিলাষিণী, ছলনাময়ী নারীর স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে এ গল্পে। বিক্রম দাস একজন ধনী ব্যবসায়ী। বয়স পঞ্চাশের বেশি হলেও নারীর প্রতি তার আকর্ষণ কমেনি। তাই এ বয়সেও পত্নী মারা যাবার দু মাসের মধ্যেই তিনি আনন্দীবাঈকে বিবাহ করেন। তারপর সম্প্রতি

আরো দুটি বিবাহ করেছেন। তাদের একজন মুম্বাইবাসী রাজহংসী ঝলকানী ও অন্যজন কলকাতাবালী বলাকা হোড় চৌধুরী । এরপর পত্নীর সংখ্যাটা হয়তো আরো বাড়তে পারতো যদি না আইনের মার প্যাঁচে এক জটিল সমস্যার মধ্যে তিনি পড়তেন। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের চাপে পড়ে একটি মাত্র স্ত্রীকে রাখার কথা তিনি ভাবতে বাধ্য হলেন। কিন্তু সমস্যা হল কাকে রাখবেন আর কাকে বাদ দেবেন। তিনি মনে মনে স্থির করলেন রাজহংসী ও বলাকার মধ্যে একজনকে রাখবেন কেননা দুজনেই তারা আল্টা মডার্ণ। এক এক করে তিনি তিন স্ত্রীরই মনোভাব বোঝার চেষ্টা করলেন। রাজহংসী জানাল :

> ''তোমার আরও দুই জরু আছে তাতে হয়েছে কি, আমি ওসব গ্রহ্য করি না, তুমি নিশ্চিন্তে থাক সব ঠিক হৈ। তবে কথাটা যেন জানাজানি না হয়।...হ্যাঁ ভাল কথা, এই বাড়িটা জলদি আমার নামে রেজিষ্টারি করা দরকার। মিউনিসিপ্যালিটি বড় হয়রাণ করছে।''[১০৪]

কলকাতাবাসী আরেক স্ত্রী বলাকা জানালো :

> ''ওঃ শেঠজী, তুমি একটি আসল পানকৌড়ি, নটবর নাগর। তা তুমি এমন মুষরে গেছ কেন, তিনটে বউ আছে তো হয়েছে কি? ঠিক আছে তুমি ভেব না, আমি হিংসুটে মেয়ে নই। কিন্তু তুমি যেন সবাইকে বলে বেড়িয়ো না।...হ্যাঁ ভালো কথা দেখ শেঠজী, একটা নতুন মোটর কার না হলে চলছে না, পুরানো অস্টিনটা হরদম বিগড়ে যাচ্ছে। তুমি হাজার কুড়ি টাকার একটা চেক আমাকে দিও, তার কমে ভাল গাড়ি মিলবে না।''[১০৫]

এরপর তিনি গেলেন আনন্দীবাঈ-এর কাছে। সব খুলে বলতেই আনন্দী গর্জন করে বললেন :

> ''চোপ রহো শড়ক কা কুত্তা, ডিরেন কা ছুছুন্দর। এই বলেই বাঘিনীর মত লাফিয়ে গিয়ে শৈঠজীর দুই গালে খামচে দিলেন। তার পর পিছু হটে তাঁর বা হাত থেকে দশ গাছা মোটা মোটা চুড়ি খুলে নিয়ে স্বামীর মস্তক লক্ষ্য করে ঝন ঝন শব্দে নিক্ষেপ করলেন। শেঠজীর কপাল ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো, তিনি চিৎকার করে ধরাশায়ী হলেন। ততোধিক চিৎকার করে আনন্দীবাঈ তাঁর পূজার ঘরে চলে গেলেন এবং মেঝেয় শুয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।''[১০৬]

বিক্রম দাসের সমস্যার সমাধান খুব সহজেই হয়ে গেল। পতিগতপ্রাণা সতী স্ত্রী এবং আধুনিক কালচার বিলাসী মেকী স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে অসুবিধা হল না তার।

'দাঁড়কাগ' গল্পে 'দাঁড়কাগ' কোন পাখি নয়। শ্যামা ওরফে তমিস্রার ডাক নাম। কালো আর শ্রীহীন বলে লোকে তাকে দাঁড় কাগ বলে। হিন্দিতে ডাকা হয় 'কৌআ দিদি'। তমিস্রা নিজের রূপ সম্পর্কে সচেতন। তাই বলে হীনমন্যতায় সে কখনো ভোগে না। এরকম যার ভাবনা তাকে আঘাত করা সত্যিই কঠিন। কাঞ্চনও পারেনি। তাই দামী শাড়ি কিনে রূপসী শম্পাকে দিতে গিয়ে সেখান থেকে প্রত্যাখাত হয়ে তমিস্রাকে সেটি দিতে চাইলে :

> ''তমিস্রা খল খল করে হাসল, যেন শূন্য বালতির ওপর কেউ কল খুলে দিল। তারপর বলল, এই ফিকে নীল শাড়ীটা নিশ্চয় আমার জন্য কেনেননি, শম্পাকে দিতে গিয়েছিলেন, সে হাঁকিয়ে দিয়েছে তাই আমাকে দিচ্ছেন। মাথা ঠান্ডা করুন, রাগের মাথায় বোকামি করবেন না ।''[১০৭]

কাঞ্চন নিজেও ভাবেনি যে তমিস্রার দ্বারাও সে প্রত্যাখাত হতে পারে। আর, তমিস্রা, অন্তরে সে আঘাত পেয়েছে ঠিকই কিন্তু এরকম আঘাত তার গা সওয়া গয়ে গেছে। এখন আর সে এরকম আঘাতে আহত হয় না। আসলে কৌয়া দিদি অশ্রুকে জমিয়ে আইসক্রীমে পরিণত করেছে, তার উপর হাসির সূর্য কিরণ পড়ে বড় মনোহর দেখাচ্ছে।[১০৭]

(৭) শিশুচরিত্রপ্রধান গল্প :

শিশু চরিত্র নিয়ে পরশুরাম কয়েকটি ছোটগল্প রচনা করেছেন। শিশুমনের হাস্যকর অসংগতি ও অদ্ভুত কল্পনা প্রবণতা নিয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় যেমন বহু ছোটগল্প রচনা করেছেন তেমনি পরশুরামেরও কিছু গল্পে শিশু চরিত্র হাস্যরসের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। এ গল্পগুলি হল 'কৃষ্ণকলি', রটন্তীকুমার', 'শিবামুখী চিমটে', 'ধনুমামার হাসি' প্রভৃতি।

'রটন্তীকুমার' গল্পে রটাই তার শিশুসুলভ সরল বুদ্ধিতে নিজেরই অজান্তে কৃত্রিম রোমান্স সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে পন্ড করে দিয়েছে। রুবির মায়ের বহু যত্নে নির্মিত রুবির জন্যে কোর্টশিপের আয়োজনকে রটাই মুহূর্তের মধ্যে যেভাবে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে তা সত্যিই কৌতুককর :

> '' রুবির মা বললেন কই, কিছুই তো খাচ্ছ না বাবা খগেন, আরও দুটো কচুরি আর প্যাটিস দিই। বল্ না রে রুবি ভাল করে খেতে, এত খেটে সব তৈরী করলি, না খেলে মেহেনত সার্থক হবে কেন। সব জিনিস কেমন হয়েছে বাবা?

খগেন বললে অতি চমৎকার হয়েছে, এমন খাবার কোথাও খাইনি। উৎফুল্ল হয়ে রুবির মা বললেন, সত্যি? তোমার জন্য রুবি সমস্ত নিজের হাতে তৈরি করেছে, ওর রান্নার হাত অতি চমৎকার।

রটাইএর মুখ কচুরিতে বোঝাই, তবু সে চুপ করে থাকতে পারল না। মুখের ডেলাটা একপাশে ঠেলে রেখে জড়িয়ে বললে, বারে, ওসব তো আমার বড়দি করেছে।

রুবির মা গর্জন করে বললেন, চুপ কর্ অসভ্য ছেলে! যা জানিস না তা বলতে আসিস কেন?

কচুরিপিন্ড কোঁত করে গিলে ফেলে রটাই বললে, বাঃ, আমিই তো বাড়ি থেকে সব নিয়ে এলুম।'' [১০৮]

এখানেই শেষ নয়, পথে খগেনবাবুর সঙ্গে দেখা হলে রটাই তার শিশুসুলভ সরল মন্তব্যে এই কৃত্রিম কোর্টশিপের দফারফা করে ছেড়েছে :

''রুবিদি শুধু আলু সেদ্ধ আর ডিম সেদ্ধ করতে পারে। ব্যাঙের ছবিটা তার আঁকা বটে, কিন্তু সেই যে পদ্মফুল আর মুরগির ছবি-ওয়ালা টেবিল ক্লথটা আপনাকে দেখিয়েছে সেটা রুবিদি তৈরী করেনি। মানিকদের বাড়ির পাশের বাড়িতে আমাদের ক্লাসের কেল্টে থাকে, তারই পিসিমা ওটা বানিয়েছে। আমি ওদের বাড়ি যাই কি না, তাই সব জানি।'' [১০৯]

খগেনবাবুর সঙ্গে রুবির কোর্টশিপ ভেঙ্গে গেলেও রটাই কিন্তু একটি কাজের কাজ করতে পেরেছে। সে খগেনবাবুকে তার শিশুসুলভ বাচনভঙ্গী দিয়ে তার দিদির প্রতি কৌতুহলী করে তুলেছে। যে সুপাত্রের সংবাদ তার অভিভাবকেরা বিন্দুমাত্র জানতেন না সেই সুপাত্রকে বাড়িতে এনে হাজির করেছে সে। গল্পের শেষে রটাইয়ের দিদির সাথে খগেনের যে বিবাহ হয়েছে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কিন্তু রটাইয়ের।

রটন্তীকুমার হাস্যরসাত্মক গল্প হলেও এ গল্পের পরিণতিতে রয়েছে কিন্তু করুণরসের আবেদন। রটাইয়ের ক্রিয়াকলাপ, কথাবার্তা যতই হাসির খোড়াক হোক না কেন খগেনবাবু ও রুবির কৃত্তিম কোর্টশিপ ভেঙ্গে যাওয়ার মধ্যে আমরা যতই আনন্দ উপভোগ করি না কেন গল্পের পরিণতিতে রুবি ও তার মায়ের জন্য কোথায় যেন পাঠক হৃদয় বেদনায় আচ্ছন্ন হয়।

এটাই তো হিউমারের লক্ষ্মণ। তাই পরশুরামের এই গল্পটিকে আমরা হিউমাররসাত্মক গল্প বলতে পারি ।

'কৃষ্ণকলি' এরকমই একটি প্রচ্ছন্ন অশ্রুঘেষা গল্প। হাসি এর মধ্যে নেই তবে একধরণের স্নিগ্ধপ্রসন্নতা আছে। প্রমথনাথ বিশী এ গল্পটি সম্পর্কে বলেছেন :

> "'কৃষ্ণকলি' গল্পে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য কোন প্রকার অশ্রু থাকার কথা নয়, তবু প্রচ্ছন্ন অশ্রুর তালিকায় গল্পটির নাম লিখতে ইচ্ছা করে। গল্পটি শিউলিফুলের মত সুকুমার ও স্পর্শকাতর। শিউলি ফুলে যদি শিশিরের আভাস থাকে, তবে এ গল্পটিতেও অশ্রুর আভাস আছে।"[১১০]

একটি আটবছরের বালিকাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে এ গল্পের কাহিনি রচিত। কৃষ্ণকলি তার আসল নাম নয়, লেখকের দেওয়া নাম। মাত্র আট বছর বয়সেই তার বিবাহ হয়েছে। এই বয়সেই সে বুঝে গেছে যে স্বামীর নাম ধরে ডাকতে নেই, পরপুরুষের স্পর্শ পেতে নেই, পূজোর দিন খেতে নেই। অবশ্য কৃষ্ণকলির কপাল ভালো যে আট বছর বয়সেই সে শাশুড়ীর কাছ থেকে সতীলক্ষ্মী সার্টিফিকেট আদায় করেছে, এক মা হারিয়ে আরেক মা পেয়েছে, এমন বর পেয়েছে যাকে নির্বিবাদে চিমটি কাটা চলে, আর হিড় হিড় করে টেনে আনা যায়। এরকম কৃষ্ণকলি তো আমাদের দেশে একটি নয় অজস্র রয়েছে। কৃষ্ণকলির না হয় কপাল ভালো, কিন্তু যাদের কপাল ভালো নয় তাদের অবস্থা কি হয় এ প্রশ্নও রাজশেখর রেখেছেন এ গল্পের মধ্য দিয়ে।

'রটন্তীকুমার' গল্পে রটাই যেমন তার শিশু সুলভ বুদ্ধি নিয়ে নিজেরই অজান্তে তার দিদির কোর্টশিপকে সফল করে তুলেছে **'শিবামুখী চিমটে'** গল্পের ঝিন্টুও তার শিশুসুলভ বুদ্ধিতে তার পিসিমার কোর্টশিপের মধ্যস্থতা করেছে। ঝন্টুর পিসিমা সরসী অনূঢ়া। অবশ্য এর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে প্রেমিকের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার স্মৃতি। বারো-তেরো বছর আগে কলেজে পড়াকালীন সরসীর সঙ্গে প্রেম হয় দুর্লভ তালুকদারের। দুর্লভ তালুকদার কিছুদিন পরে চাকরী পেয়ে কানপুর চলে যায়। প্রথম প্রথম যোগাযোগ থাকলেও পরে সে সরসীর কথা বেমালুম ভুলে যায়। কিন্তু ষোড়শী তাকে ভুলতে পারে না। তারই প্রতীক্ষায় সে বসে থাকে। অবশেষে দুর্লভ তালুকদারকে নিয়ে ষোড়শীর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয় যখন মদের নেশায় চুর হয়ে থাকা দুর্লভ চক্রবর্তী তার সামনে হাজির হয় এবং সরসীকে জানায় যে ইতিমধ্যেই সে দুটো বিবাহ করেছে। সরসীর সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তখন সরসীর মনে পড়ে তার অফিসের হেড অ্যাসিষ্টেন্ট যোগীনবাবুর কথা। যোগিনবাবু প্রৌঢ়, বিপত্নীক, আনকালচার্ড, মুখদিয়ে হুকোর

গন্ধ ছোটে। তা সত্ত্বেও যোগীনবাবুকে বিয়ে করতে সে রাজী হয়। আর এই বিবাহের মধ্যস্থতা করে ঝিন্টু। গল্পটিতে সমস্ত ঘটনাই অলৌকিক উপায়ে বর্ণিত হলেও তা বাস্তব সীমা অতিক্রম করে নি। ঝিন্টু তার শিবামুখি চিমটের দ্বারা অলৌকিক উপায়ে যেভাবে তৎক্ষণাৎ হাজির করেছে দুর্লভ তালুকদার ও যোগীনবাবুকে বাস্তবে এমন ঘটনা একটু সময় সাপেক্ষ হলেও তা অসম্ভব নয়।

(৮) পশুপাখী বিষয়ক গল্প :

বাংলা সাহিত্যে পশুপাখীদের নিয়ে রচিত গল্পের সংখ্যা খুব কম নয়। মানবেতর প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের সুসম্পর্ক এ গল্পগুলিতে দেখানো হয়েছে। স্নেহ প্রেম বাৎসল্য, প্রভুভক্তি নিয়ে রচিত এ গল্পগুলি বাংলা ছোটগল্পের সম্পদ। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', প্রভাত কুমারের 'আদরিণী', তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়', 'গবিন সিংহের ঘোড়া', 'নারী ও নাগিনী', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'কুইন অ্যান', রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া' বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত মানবেতর প্রাণীদের নিয়ে লেখা গল্প। পরশুরামও এধরণের কিছু গল্প লিখেছেন। **'লম্বকর্ণ'**, **'গুরু বিদায়'**, **'দক্ষিণ রায়'**, **'লক্ষ্মীর বাহন'**, **'জয়হরির জেব্রা'**, **'রাজমহিষী'**, **'নবলাল'** প্রভৃতি গল্পগুলির কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তবে পশুর স্নেহ প্রেম, বাৎসল্য প্রভুভক্তির তুলনায় এ গল্পগুলিতে ব্যঙ্গশিল্পী পরশুরামের উপস্থিতি অনেক বেশি করে চোখে পড়ে।

'লম্বকর্ণ' গল্পে লম্বকর্ণ আসলে একটি ছাগল। বংশলোচনবাবু সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়ে একটি ছাগলের খপ্পড়ে পড়েন : ''বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছাগল। কুচকুচে কালো নধর দেহ, বড় বড় কানের উপর কচি পটলের মত দুটি শিং বাহির হইয়াছে। বয়শ বেশি নয়, এখনও অজাতশ্মশ্রু।'' ছাগলটি তার পিছু নেয় এবং বাড়ি পর্যন্ত চলে আসে। ছাগলটিকে পোষার জন্য বংশলোচনের ইচ্ছা হলেও পত্নীর তীব্র আপত্তিতে তার সে ইচ্ছ বাস্তবায়িত হয় না। বন্ধুরা ছাগলটিকে কেটে মাংস খাবার চেষ্টা করলেও বংশলোচন তা করতে রাজী হয় না। কিন্তু রাত্রী বেলা লম্বকর্ণ তাহার বন্ধন রজ্জু চিবিয়ে কেটে ফেলে। খবরের কাগজ উদরস্থ করে, 'গীতা' খেয়ে ফেলে, প্রদীপের তেল খেয়ে নেয়। বংশলোচন অতিষ্ট হয়ে পরদিন সকালে লাটুবাবুর হাতে লম্বকর্ণকে দিয়ে দেয়। কিন্তু লম্বকর্ণ লাটুবাবুকেও নিস্তার দেয় না। লম্বকর্ণ একে একে লাটুবাবুর ঢোলের চামড়া, হারমোনিয়ামের চাবি এবং সর্বোপরি লাটুবাবুর পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট উদরস্থ করে। তাই লাটুবাবু লম্বকর্ণকে বংশলোচনের কাছে ফেরৎ দেয় এবং তার ক্ষতিপূরণ দাবি করে। বংশলোচন লাটুবাবুকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদেয় করে। এদিকে বংশলোচনের সঙ্গে তার স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ বেড়েই চলে। পরদিন বংশলোচন সহস্তে লম্বকর্ণকে বিসর্জন দিয়ে

বাড়ি ফিরে আসার সময় প্রচন্ড ঝড় জলের মধ্যে সংজ্ঞা হারান। ভাগ্যিস লম্বকর্ণ ছিল নতুবা বংশলোচনকে ফিরে পাওয়া হত না মানিনীর। কেননা লম্বকর্ণই বংশলোচনের অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর মানিনীদেবীকে এসে জানিয়েছে। এরপর থেকে লম্বকর্ণ তাদের বাড়িতেই থেকে যায়।

দাম্পত্য জীবনের সংঘাতকে অবলম্বন করে যে গল্পের শুরু হয়েছিল সেই গল্পটি একটি মধুর সমাপ্তি লাভ করল। একটি ছাগলকে কেন্দ্র করে একটি চমৎকার হাসির গল্প পরিবেশিত হয়েছে এখানে। হাসির প্রধান উপকরণ অবশ্যই লম্বকর্ণ এবং তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ এবং নানা মন্তব্য। বৃহৎ কোন সামাজিক সমস্যাকে এ গল্পে তুলে ধরেননি লেখক। পারিবারিক জীবনের দাম্পত্য কলহের একটি টাইপ চিত্র দেখানো হয়েছে এখানে। সংসার জীবনে এ ধরণের দাম্পত্য কলহ যে কতটা হাস্যকর তার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন লেখক। চরিত্রগুলির কথোপকথন, তাদের বাকচাতুর্য, লম্বকর্ণের ক্রিয়াকলাপ সব মিলিয়ে হাস্যরসের গল্প হিসেবে এটি একটি অসাধারণ সৃষ্টি।

'নিরামিষাশী বাঘ' গল্পে বনের বাঘকে নিরামিষ আহার দিয়ে পোষ মানানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা, বাঘিনী ধরে এনে তাদের বিয়ের বন্দোবস্ত করা এবং উপায়ন্তর না দেখে তাদেরকে চিরিয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে মানুষের বুদ্ধিভ্রংশকারী অদ্ভুত খেয়ালের পরিচয়।

'জয়হরির জেব্রা' গল্পটিতে বিভিন্ন পশুপাখীর প্রসঙ্গ থাকলেও গল্পটি কিন্তু রোমান্টিক ধরণের। আত্মম্ভরিতা কীভাবে শত্রুতার মাধ্যমে প্রণয়ে রূপান্তরিত হয় তার একটি বিশেষ রূপ দেখানো হয়েছে 'জয়হরির জেব্রা' গল্পে। এ গল্পের নায়িকা বিলেতে জন্মেছিলেন। সেই কারণে এবং ধনীর আদরের দুলালী হওয়ায় তার আত্মম্ভরিতার সীমা নেই। এই আত্মম্ভরিতার মাধ্যমেই সে চেয়েছিল জয়হরিকে শায়েস্তা করতে। জয়হরির দোষ তার পোষা কুকুরটি বেতসীর পোষা বিলেতী কুকুর প্রিন্সকে কামড়ে দিয়েছে। কিন্তু জয়হরিকে শায়েস্তা করতে গিয়ে বেতসী নিজেই জব্দ হয়েছে। ঘোড়া থেকে পড়ে খোড়া হয়ে টানা একমাস সে বাড়িতে আটকে থাকে। এ অবস্থাতেই সে খবর পায় যে তার মামাতো বোন বেবির সঙ্গে জয়হরির কোর্টশিপের আয়োজন করতে চলেছে তার মা। ব্যাস জয়হরির প্রতি বেতসীর অবচেতন মনের গোপন মনোভাব প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সারারাত তার ঘুম হয় না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে জয়হরিকে চিঠি লেখে : ''আপনার কুত্তি আর গাধাটাকে ক্ষমা করলুম। আপনাকেও করলুম। আপনিও আমাকে ক্ষমা করতে পারেন।''[১১১]

'লম্বকর্ণ' গল্পের লম্বকর্ণকে আমরা পুনরায় দেখি **'গুরুবিদায়'** গল্পে। মানিনী দেবী ভন্ড গুরুদেবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারলেও তার যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি

করেছিল তার অত্যন্ত আদরের লম্বকর্ণ। তাই গুরুদেবকে দেখা মাত্র তাঁর শিংএর গুতায় তাকে ধরাশায়ী করেছিল সে।

'লক্ষ্মীর বাহন' গল্পে প্যাঁচাটিও বেশ মনে রাখার মতো। একটি বিশেষ শ্রেণির প্যাঁচাকে লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে মনে করা হয়। এই রকম একটি লক্ষ্মীর বাহনের আকস্মিক আবির্ভাব এবং তাকে নিয়ে ব্যবসায়িক মহলে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি হাঙ্গামা, আফিম খাইয়ে তাকে বশ করবার অদ্ভুত ফন্দী ও শেষপর্যন্ত তার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাবসায়ী মুচুকুন্দের ভাগ্য বিপর্যয় 'লক্ষ্মীর বাহন' গল্পটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন ঘরে প্যাঁচার আবির্ভাবে মুচুকুন্দের স্ত্রী অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি ভাবলেন সেটি লক্ষ্মী প্যাঁচা। প্যাঁচাটিকে তারা ধীরে ধীরে পোষ মানালেন। পেঁচার আগমনের সঙ্গ সঙ্গে মুচুকুন্দের কারবারে উন্নতি দেখা গেল। কিন্তু মুচুকুন্দের ব্যাবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী কৃপারাম আর পঞ্চানন বিষয়টি টের পেলেন। তারা সেই প্যাঁচার অধিকারের দাবী নিয়ে এলেন মুচুকুন্দের কাছে। শুরু হলো হুলস্থুল কান্ড। স্ত্রী মাতঙ্গী উপযুক্ত সহধর্মিণী। তিনি বৈষয়িক স্বামীর পরিপূরকরূপে অধ্যাত্মশৃঙ্খলে সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে চিরতরে বন্দী করবার মতলব আঁটেন এবং শেষ পর্যন্ত প্যাঁচা ফাঁকি দিলে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন: ''পেঁচাটা লক্ষ্মী পেঁচাই নয়, নিশ্চয় হুতম পেঁচা, ভোল ফিরিয়ে এসেছিল ।''[১১২]

(৯) রাজনীতি বিষয়ক গল্প :

পরশুরামের রাজনীতি বিষয়ক গল্পগুলি হল **'দক্ষিণ রায়'**, **'উলট পুরাণ'**, **'তিনবিধাতা'** প্রভৃতি। রাজনীতি নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কর্ম, দেশসেবা করার এক মহৎ হতিয়ার। কিন্তু এই রাজনীতি যখন অধম স্বার্থান্বেষী মানুষের আখড়ায় পরিণত হয় তখন রাজনীতির মহান ব্রত হয় কলুষিত। পরশুরাম ভারতীয় রাজনীতির এই কলুষিত চেহারা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বার্থের কথা মাথায় না এলে কেউ রাজনীতি অভিমুখী হয় না। শুধু তাই নয় রাজনীতিতে যোগ দেওয়া মানুষদের মানসিকতাকে তিনি অনুধাবন করে'ছিলেন। মনে রাখতে হবে পরশুরাম নিজে কোন রাজনৈতিক দলের লোক ছিলেন না। ফলত: কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বও ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতি বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সংবাদ রাখতেন। পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতিও তিনি যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনি স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতিও তাঁর প্রত্যক্ষগোচরে ছিল। এই দুই পর্বের রাজনীতির মৌলিক পরিবর্তনও তিনি উপলব্ধি করেছেন। 'দ্বান্দ্বিক কবিতা' গল্পে সেই উপলব্ধিরই বহি:প্রকাশ ঘটেছে যতীশ মিত্রের কণ্ঠে :

''কালক্রমে সবই বদলে যায়। ডবলু. সি. ব্যানার্জির সময় কংগ্রেস যা ছিল এখনও কি তাই আছে? লেনিন আর ট্রটস্কির পলিসি কি এখনও বজায় আছে। বেঁচে থাকলে আরও কত কি দেখবেন সর্বজ্ঞ মশাই।''[১১৩]

তাই একদিকে তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের ইংরেজের ঔপনিবেশিক রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করেছেন অন্যদিকে স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভন্ডামি এবং রাজনীতিবিদদের স্বার্থান্বেষী মনোভাবও তাঁর ব্যঙ্গ বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছে।

পরশুরামের রাজনীতি বিষয়ক গল্পগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে **'দক্ষিণ রায়'** গল্পটির কথা। **'দক্ষিণ রায়'** গল্পটি ইলেকশন বা ভোটাভুটির উপর এক নির্মম ব্যঙ্গ রচনা। **'দক্ষিণ রায়'** গল্পে স্বার্থান্বেষী, ধূর্ত বকুবাবুর রাজনীতিতে উত্থানের চিত্রের মধ্য দিয়ে রাজনীতিবিদদের ভন্ডামিকে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি :

বকুবাবু যেদিন পঞ্চান্ন বৎসরে পড়লেন, সেই রাত্রে বঙ্গমাতা তাকে বললেন—বৎস বকু, বয়স তো ঢের হ'ল, টাকাও বিস্তর জমিয়েছ। কিন্তু দেশের কাজ কি করলে? বকুলাল জবাব দিলেন—মা, আমি অধম সন্তান, বক্তৃতা দেওয়া আসে না, ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশে যেতে পারি না, খদ্দর আমার সয় না—সুখের শরীর—দেশী মিলের ধুতিতেই পেট কেটে যায়। আর বোঝা দূরে থাক,—একটা ভুঁই-পটকা ছোঁড়বার সাহসও আমার নেই। কি কর্তব্য তুমিই বাতলে দাও। খাটুনির কাজ আর এ বয়সে পেরে উঠব না, সোজা যদি কিছু থাকে তাই বলে দাও মা। বঙ্গমাতা বললেন—কাউন্সিলে ঢুকে পড়।''[১১৪]

রাজনীতিবিদদের পরস্পরের মধ্যে যে কাদাছোড়া চলে তাকেও ব্যঙ্গ করেছেন পরশুরাম এ গল্পে। বকুলাল রাজনীতিতে প্রবেশ করার পর তার নাম ছড়িয়ে পড়ল। তার শত্রু পক্ষের সংখ্যাও বাড়তে থাকল। খবরের কাগজে নানা রকম কেচ্ছা বার হ'তে লাগল :

''বকুলাল দত্ত—সেটাকে কে চেনে? কেরাণীর অত পয়সা কি করে হ'ল? হে দেশবাসী গন, বকুলাল অত সোডা ওয়াটার কেনে কেন? কিসের সঙ্গে মিশিয়ে খায়? বকুর বাগান বাড়িতে রাত্রে আলো জ্বলে কেন? বকুলাল কালো, কিন্তু তার ছোট ছেলে ফরসা হ'ল কেন? সাবধান বকুলাল, তুমি শ্রীযুক্ত রামজাদুর সঙ্গে পাল্লা দিতে যেয়ো না, তা হ'লে আরও অনেক কথা ফাঁস করে দেব। বকুবাবুও পাল্টা জবাব চাপতে থাকলেন, কিন্তু তত জুতসই হ'ল না, কারণ তাঁর তরফে জোরালো সাহিত্যিক গুন্ডা ছিল না।''[১১৫]

এখানে শুধু রাজনীতিবিদ নয় সাহিত্যিকদেরকেও ব্যঙ্গ করেছেন পরশুরাম। কেননা কিছু সাহিত্যিক থাকে যারা নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করার অভিলাষে আশ্রয় নেয় কোন রাজনীতিবিদদের ছত্রছায়ায়। তাদের হয়ে গলা ফাটায়। প্রয়োজনে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে কাব্যিক গালিগালাজ করতেও ছাড়ে না। পরশুরাম এদের সাহিত্যিক গুন্ডা বলে অভিহিত করেছেন এখানে।

'উলট-পুরাণ' গল্পটিও হাস্যরসিক পরশুরামের অভিনব সৃষ্টি। এই অভিনবত্ব এসেছে বিষয় ভাবনায় ও প্রকরণ কৌশলে। গল্পের চারটি ছাড়া-ছাড়া চিত্রে খন্ড খন্ড কাহিনির আভাস পাওয়া যায়। গল্পটির প্রথমেই পাই রিচমন্ড বঙ্গ-ইঙ্গিয় পাঠশালার পন্ডিত মশায় মিষ্টার ক্র্যাম ও তাঁর ডিক, টম, হ্যারি ইত্যাদি বালকদের নিয়ে ছাত্র পড়ানোর চিত্র। এরপর ছাত্র টমের কথায় নতুন খেতাব পাওয়ার কারণে খাঁ সাহেব গবসন টোডির অন্দর মহলে গবসনের স্ত্রী, দুই কন্যা ও তাদের শিক্ষয়িত্রী জ্যোৎস্নাদির বাংলা ভাষা শেখানো ও সভ্য সমাজের আচার-আচরণ বিষয়ক কিছু হাস্যকর আলোচনা। তৃতীয় খন্ডচিত্রে আছে হাইড পার্কে তিন হাজার লোকের সামনে চতুর স্বার্থান্বেষী দেশসেবকের ভেকধারী রাজনৈতিক নেতা স্যার ট্রিকসি টার্ণকোর্টের সুযোগসন্ধানী স্ববিরোধী বক্তৃতার উপস্থাপনা। শেষ চতুর্থ খন্ডচিত্রে মেলে ভোমস্টার্ট প্রাসাদে দেশীয় সামন্ত রাজা প্রিন্স ভোমের আত্মতৃপ্ত অলস এবং বিলাসী জীবনের স্বভাব ছবি এবং শাসক শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত ও প্রদত্ত তথাকথিত স্বাধীন সুখীজীবন ও ভোগবাসনার সঙ্গে যুক্ত আত্মরক্ষার শ্লেষাত্মক দিক। গবসন টোডির প্রসঙ্গ এখানে নেই। দ্বিতীয় চিত্রের পরে লন্ডনে বিরাট রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপিত হয়েছে। গল্পের শেষ চিত্রে দু'মাস হরতালের মধ্যে সেই যজ্ঞের সমাপ্তি ঘোষণার সংবাদ মেলে। প্রত্যেকটি খন্ডচিত্রকে সূত্রবদ্ধ করেছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভের কিছু অংশের উদ্ধৃতি, কিছু সংবাদ পত্রে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন, রিপোর্টাজ বা সংবাদপত্রের প্রতিবেদন। এসব থেকে জানা যায় পুরুষজাতীর দেশীয় সংসদে এতাবৎ একটানা একাধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে নারী জাতির প্রতিবাদ, আন্দোলন ইত্যাদির মতো কৌতুককর অবস্থার খবর। ট্রিকসি টার্ণকোর্টের সরকার গঠিত কমিশনের প্রেসিডেন্ট হওয়াতেই গল্পের শেষ।

'উলট-পুরাণ' গল্পটি পরশুরামের অসাধারণ সৃষ্টি। এই গল্পের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিত্রেরই একটি চমৎকার ব্যঙ্গচিত্র দেখানো হয়েছে। 'উলট-পুরাণ' গল্পে ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্ক শাসক ও শাসিতের উল্টো দিক থেকে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ এ গল্পে ঐ ভারতবাসীই শাসক এবং ইংরেজরা শাসিত। এই বিপরীত কল্পনার মধ্য দিয়ে তীব্র হাস্যরস জমে উঠেছে। তবে এ গল্পে পরশুরাম ভারতবাসীর বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তীব্র ভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। সুযোগসন্ধানী টার্নকোর্টের মধ্য দিয়ে স্বার্থান্বেষী ভারতবাসীকে কটাক্ষ করা হয়েছে। টার্ণকোর্ট জনসভায় তার ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রথমে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিরাট রাজসূয় যজ্ঞে

ইংলন্ডবাসীকে যেতে নিষেধ করেছেন। অথচ যখন লর্ডব্লার্ণি এসে তাকে চাকরির টোপ দিয়েছে তখনই সে সরকার বিরোধী-বক্তব্য থেকে সরে এসেছে। আবার পরক্ষণেই যখন জানতে পেরেছে যে সেই চাকরিটা হবার নয় তখন সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছে :

> ''...এই রাজসূয় যজ্ঞে তোমাদের যেতেই হবে। কেন যেতে হবে? বাতাসা খেতে? সেলাম করতে? ভারত সরকারের জয়জয়কার করতে? নেভার। সেখানে যাবে যজ্ঞ পন্ড করতে, লন্ডভন্ড করতে—ভারত সরকার যেন বুঝতে পারে যে তামাশা দেখিয়ে আর বাতাসা খাইয়ে তোমাদের আর ভুলিয়ে রাখা যাবে না।''[১১৬]

রাজশেখর বসু স্বদেশকে ভালো ভাবেই চিনেছিলেন। দেশের পরাধীনতা, দেশবাসীর নানা যন্ত্রণা তাকে ভীষণভাবে ব্যথিত করেছিল। সেভাবে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ হয়তো গড়ে তুলতে তিনি পারেননি কিন্তু অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন পরাধীন ভারতের দুঃস্থ অবস্থা। 'উলট পুরাণ' গল্পে তাই তাঁর আক্ষেপ :

> ''একবার ভাবিয়া দেখ তোমার এই মেরি ইংল্যান্ড—যেখানে একদা দুগ্ধ ও মধুর স্রোত বহিত—তাহার কি দশা হইয়াছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বীফ নাই, মাখন নাই, পনির নাই— এইবার বিয়ারও বনধ হইবে। বিদেশ হইতে গম আসে তবে তোমার রুটি প্রস্তুত হয়। তোমার ভেড়ার লোম ছাটা মাত্র পাঞ্জাবে যাইতেছে এবং তথা হইতে বনাত কম্বলরূপে ফিরিয়া আসিয়া তোমার অঙ্গে উঠিতেছে। ভারতের কার্পাস বস্ত্র তোমার বিখ্যাত লিনেন শিল্প নষ্ট করিয়াছে। হায় তুমি কাহার বসন পরিয়াছ? তোমার নগ্নতা ঘুচিয়াছে কিন্তু লজ্জা ঢাকে নাই, শীত নিবারিত হইয়াছে কিন্তু তুমি অন্তরে অন্তরে কাঁপিতেছ। তোমার ভাল-ভাল গো-বংশ ভারতে নির্বাসিত হইয়াছে, সেখানকার হিন্দু মুসলমান ক্ষীর-ছানা ঘি খাইয়া নির্দ্বন্দ্বে মোটা হইতেছে। বিয়ার হুইস্কির আস্বাদ তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, ভারতের গাঁজা আফিম তোমার মস্তিষ্কে শনৈঃ শনৈঃ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তোমার সর্বনাশের উপরে ভারত তাহার ভোগবিলাসের বিরাট মন্দির খাড়া করিয়াছে।''[১১৭]

'তিন বিধাতা' গল্পে মানুষের সমস্ত উচ্চস্তরের আলাপ অর্থাৎ হাইলেভেল টক যখন ব্যর্থ হল তখন ব্রম্মা, গড আর আল্লা সুমেরু অর্থাৎ হিন্দকুশ পর্বতে সমবেত হলেন। সভা শুরুর প্রথমেই সভাপতিত্ব নিয়ে এই তিন বিধাতার মধ্যে শুরু হল কোন্দল। অবশেষে তিনজনই সভাপতিত্ব করার সিদ্ধান্ত নিলেন। নারদ ওই সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করলেন,—''জগতে যাতে শান্তি আসে মারামারি কাটাকাটি দ্বেষ হিংসা অত্যাচার প্রতারণা লুণ্ঠন

প্রভৃতি পাপ কার্য যাতে দূর হয় তার একটা উপায় স্থির করা।''[১১৮] অবশ্য কোন উপায়ই শেষ পর্যন্ত স্থির হল না। শয়তানের আগমনে সভা মধ্য পথেই ভঙ্গ হল।

বর্তমান সময়ে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, দুষ্কৃতিমূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধির জন্য যে অনেকক্ষেত্রেই প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরাই দায়ী তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে গল্পটিতে। দুষ্কৃতকারীরা এ বিষয়ে যেভাবে প্রশাসনিক কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে পার্সেন্টেজ বা কমিশনের ভিত্তিতে যোগসাজস গড়ে তোলেন তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে শয়তানের সঙ্গে দেবতাদের সংলাপে :

> ''শয়তান বললেন, পিতামহ, আপনারা তিনবিধাতা এখানে এসেছেন, এমন সুযোগ আর মিলবে না; সেজন্য আপনাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে এসেছি। জগতের সমস্ত ধনী মানী মাতব্বর লোকেরা আমাকে তাঁদের দূত করে পাঠিয়েছেন। তাঁরা চান কর্মের স্বাধীনতা, কিন্তু তার ফলে ইহলোকে বা পরলোকে তাঁদের কোনও অনিষ্ট যেন না হয়। এর জন্য তারা আপনাদের খুশি করতে প্রস্তুত আছেন।

ব্রহ্মা। অর্থাৎ তারা বেপরোয়া দুষ্কর্ম করতে চান। মূল্য কি দেবেন? চাল-কলার নৈবেদ্য? হোমাগ্নিতে সের দশেক ভেজিটেবল ঘি ঢালবেন?

শয়তান। না প্রভু, ওসব দিয়ে আপনাদের আর ভোলানো যাবে না। তা তাঁরা বোঝেন। তাঁরা যা রোজগার করবেন তার একটা অংশ আপনাদের দেবেন।

ব্রহ্মা। নগদ টাকা আমরা নিতে পারি না।

শয়তান। নগদ টাকা নয়। আপনাদের খুশী করবার জন্য তারা প্রচুর খরচ করবেন। মন্দির গির্জা মসজিদ মঠ আতুরাশ্রম বানাবেন, হাসপাতাল, রেড ক্রস স্কুল কলেজ টোল মাদ্রাসায় এবং মহাপুরুষদের স্মৃতি রক্ষার জন্য মোটা টাকা দেবেন, বুভুক্ষকে খিচুড়ি খাওয়াবেন, শীতার্থকে কম্বল দেবেন। আপনার মানস পুত্রদের বংশধর কে কে আছেন বলুন, তাঁদের বড় বড় চাকরি আর মোটর কার দেওয়া হবে। এই সবের পরিবর্তে আপনারা আমার মক্কেলগণকে নিরাপদে রাখবেন।

ব্রহ্মা। কত খরচ করবেন?

শয়তান। ধরুন তাঁদের উপার্জনের শতকরা একভাগ?

ব্রহ্মা। তাতে হবে না বাপু।

শয়তান। আচ্ছা দু পারসেন্ট।

ব্রহ্মা। আমাকে দালাল ঠাউরেছ নাকি?

শয়তান। পাঁচ পারসেন্ট? দশ পনের-বিশ? আচ্ছা না হয় শতকরা পঁচিশ ভাগ আপনাদের প্রীত্যর্থে খয়রাত করা হবে। তাতেও রাজী নন? উঃ আপনার খাঁই দেখছি দেশসেবকের চাইতেও বেশী। কবছর জেল খেটেছেন প্রভু? আচ্ছা আপনিই বলুন, কত হলে খুশী হবেন।

ব্রহ্মা। শতকরা পুরোপুরি এক-শ চাই।''[১১৯]

(১০) সমাজ-অর্থনীতি বিষয়ক গল্প : যেকোন ব্যঙ্গ লেখকই সমাজসচেতন শিল্পী। কেননা যে বিষয়গুলিকে নিয়ে একজন ব্যঙ্গরসিক তাঁর শিল্পের জগৎ গড়ে তোলেন তাঁর অস্তিত্ব তো সমাজের মধ্যেই। সমাজের অসঙ্গতি নিয়েই তো ব্যঙ্গরসিকের কারবার। সে অসঙ্গতিগুলির বিষয় বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু তা বৃহৎ সমাজেরই অন্তর্গত। আলোচনার সুবিধার জন্য সে বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করি। কিন্তু যখন সে বিষয়গুলিকে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না তখন সে বিষয়গুলিকে আমরা অনায়াসেই সামাজিক গল্পের মধ্যে ফেলতে পারি। **'ষষ্ঠীর কৃপা'** এরকমই একটি গল্প।

'ষষ্ঠীর কৃপা' গল্পে পুরুষের উদ্দাম যৌনপ্রবৃত্তিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গোকুলবাবু একের পর এক বিয়ে করেছে আর সন্তানের জন্ম দিয়ে গেছে। তিন ছেলে ও এক মেয়ে থাকা সত্ত্বেও ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে দ্বিতীয় বিবাহ করেছে। প্রথম স্ত্রীকে মাসোহারা দেওয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব পালন করবার প্রয়োজন মনে করেননি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাত বৎসরের মধ্যে ছটি সন্তান জন্ম দিয়েছে। এবং স্ত্রী প্রচন্ড অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও ছ মাস যেতে না যেতেই আবার তৃতীয় বিবাহ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আমাদের সমাজে এই জাতীয় চরিত্রের সংখ্যা কম নয়। এই জাতীয় চরিত্রের প্রতি পরশুরামের তীব্র কটাক্ষ রয়েছে আলোচ্য গল্পটিতে। এর পাশাপাশি আরেকটি গুরুতর সামাজিক সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেছেন পরশুরাম এ গল্পে সেটি হল জন্মনিয়ন্ত্রণের সমস্যা। সরকার যতই জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে চাক এক শ্রেণির লোক কীভাবে তাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখায় তার জ্বলন্ত উদাহরণ গোকুল বাবু চরিত্রটি। ধর্মের দোহাই পেড়ে গোকুলবাবুর মতো চরিত্ররা কীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখায় তা একটি সংলাপের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করেছেন পরশুরাম :

''স্বামীর প্রবোধবাক্য শুনে সুকুমারী বললে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আমাকে ভুলিও না। কাগজে পড়েছি জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় বেড়িয়েছে, দিল্লীর মন্ত্রীরাও তা ভালো মনে করেন। তুমি এত খবর রাখ, এটা জান না? কলকাতায় গিয়ে মন্ত্রীদের কাছ থেকে শিখে এস।

গোকুলবাবু বললেন, তারা ছাই জানে।

—তবে বড় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি তো শুনেছি ডাক্তার।

—পাগল হয়েছ নাকি সুকু? ছি ছি ছি, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশের কুলবধূর মুখে এই কথা! অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী, একটুখানি লেখাপড়া শিখে খবরের কাগজ পরে এইসব পান্ডিত্য তোমার মাথায় ঢুকেছে। কৃত্রিম উপায়ে জন্মরোধ করা একটা মহাপাপ তা জান? প্রজাবৃদ্ধির জন্যই ভগবান স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন; গর্ভধারণ হচ্ছে স্ত্রী জাতীর বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য। ভগবানের এই বিধানের ওপর হাত চালাতে চাও?

—শুনেছি আজকাল ঘরে ঘরে চলছে, তাই প্রাণের দায়ে বলছি। আমি মুখখু মানুষ, কিছুই জানি না, ন্যায়-অন্যায়ও বুঝি না, কিন্তু ভগবানের ওপর হাত না চালায় কে? ভগবান নেংটা করে পাঠিয়েছিলেন, কাপড় পড়ছ কেন? দাড়ি কামাও কেন? দাঁত বাঁধিয়েছ কেন?

—রাধা মাধব! এসব কথা মুখে এনো না সুকু, জিব খসে যাবে।

—দিল্লীর মন্ত্রীদের তো খসে না।

—খসবে, খসবে পাপের মাত্রা পূর্ণ হলেই খসবে। শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা আছে তা পালন করলে ভগবানের বিধান লঙ্ঘন করা হয় না, তার বাইরে গেলেই মহাপাপ। এইটে জেনে রেখো যে ভাগ্যের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। তোমার সন্তানভাগ্য মন্দ ছিল তাই এতদিন দুঃখ পেয়েছ, ভাগ্য পালটালেই তুমি সুখী হবে। যা বিধিলিপি তা মাথা পেতে মেনে নিতে হয়। এসব বড় গূঢ় কথা, একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

সুকুমারী হতাশ হয়ে চুপ করে রইল।''[১২০]

শুধু 'ষষ্ঠীর কৃপা' নয় পরশুরামের আরো অনেক গল্পে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ভীড় করে এসেছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজের বেকারসমস্যা, খাদ্যসংকট, দুর্নীতি, ভেজাল, অভিজাত সম্প্রদায়ের অতি আধুনিক কালচার প্রভৃতি নানা দিক পরশুরামের গল্পে

উঠে এসেছে। 'নীলকণ্ঠ', 'রাজমহিষী' 'দাঁড়কাগ', সিদ্ধিনাথের প্রলাপ', 'সাড়ে সাত লাখ' 'শিবামুখী চিমটে' প্রভৃতি গল্পগুলির উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে।

(১১) জড়পদার্থ বিষয়ক গল্প :

পরশুরামের জড় পদার্থ বিষয়ক দুটি ছোটগল্প হল **'একগুয়ে বার্থা'** ও **'পরশপাথর'**। তবে গল্পের প্রতিবেদনে রয়েছে সেই মানুষেরই কাহিনি। যেমন 'একগুয়ে বার্থা' গল্পটি। এ গল্পের কাহিনি বলা হয়েছে ট্রেনে। এঞ্জিনের প্রাণ আছে কি নেই এই নিয়েই গল্পটি রচিত। এখানে গল্প বলেছেন মাখন মল্লিক। তিনি একটি পুরোনো জার্মান বার্থা কার কিনেছেন। কিন্তু কয়েকদিন চালানোর পর তিনি একদিন মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়েন। সেই দুর্ঘটনায় তার সঙ্গী কুমার সাহেব মারা যান। বক্তা এরপর গাড়িটি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি প্রেমের কাহিনি। এই জার্মান বার্থার পূর্বতন মালিক সলসিটার জলদ রায়। জলদ রায়ের স্ত্রী হেলেনা ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। হেলেনা আবার মকদ্দমপুরের কুমার ইন্দ্রপ্রতাপ সিংএর প্রেমে পরে। একদিন প্রচন্ড বেগে গাড়ি চালিয়ে জলদ রায় যখন যাচ্ছিলেন তখন কুমার গোটাকতক পাথরের ঢাঙর রাস্তায় রাখেন। এরফলেই জলদ রায় দুর্ঘটনায় পরেন। এরপর থেকেই বার্থা কারটি তার মনিবের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইছিল। মাখন মল্লিকের মালিকানাতে বার্থা কারটি কুমার সাহেবকে মেরে তার প্রতিশোধ নিয়েছে।

(১২) কল্প-বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ গল্প : রাজশেখর বসু বিজ্ঞানকে বিষয় করে যে কয়টি গল্প লিখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'গামানুষ জাতির কথা', মাঙ্গলিক' ও 'গগন চটি'। 'গামানুষ জাতির কথা' ও 'মাঙ্গলিক গল্প' দুটি প্রসঙ্গে শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন:

> ''পরশুরামের এই দুইটি রচনা অংশতঃ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লক্ষ্মণাক্রান্ত আবার অংশতঃ ইহারা কল্পনা বিলাসও বটে। কিন্তু প্রবন্ধে যে যুক্তি প্রমাণ থাকে তাহা এখানে নাই এবং গামানুষ বা মাঙ্গলিকের বক্তৃতায় কোথাও রসের স্পর্শ নাই।''[১২১ক]

একথা ঠিক গল্পরস এ দুটি গল্পে সে ভাবে জমে ওঠেনি। তবে গল্পকথায় ব্যঙ্গরসিক পরশুরামকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

'গামানুষ-জাতির কথা' গল্পে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িককালের লোভ-হিংসা - স্বার্থপর রাজনীতির কথা। পরশুরাম মানুষকে সরাসরি এ গল্পের চরিত্র করেননি। অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার পর যেকটি তরুণ আর তরুণি ইঁদুর দৈবক্রমে বেচে গেল তারাই এ গল্পের চরিত্র। তারা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে সারা পৃথিবী ছেয়ে গেল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র দখল করে বসল। এইসব ইঁদুরের নাম লেখক দিয়েছেন-মানুষ। তখন পৃথিবীতে মানুষ নেই

শুধুই গামানুষ। বিভিন্ন দেশের গামানুষ রাষ্ট্রপতিগণ এক মহতি বিশ্বসভা আহ্বান করলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় রাজীতিক দার্শনিক বৈজ্ঞনিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি মহা উৎসাহে সেই সভায় এসে উপস্থিত হলেন। সভা শুরু হল। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রতিনিধিরা নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করতে লাগলেন। এই সভার উদ্দেশ্য হল বিশ্বশান্তির ব্যবস্থা করা। সমৃদ্ধ, অনতিসমৃদ্ধ, অতিসমৃদ্ধ প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ বক্তব্যে একে একে অপরকে বিশ্ব অশান্তির জন্য দায়ী করলেন। এই নিয়ে চলল তুমুল বিতর্ক। তারা বিভিন্নভাবে বিশ্ব শান্তির জন্য পরামর্শ দিতে লাগলেন। কিন্তু কোন পরামর্শই গ্রহণযোগ্য হল না। অবশেষে একজন সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে দাবি করলেন যে একমাত্র তার আবিষ্কৃত শান্তি স্থাপক বোমার সাহায্যেই বিশ্বে শান্তি আসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সভায় তুমুল গোলযোগ সৃষ্টি হল। সদস্যদের টানাটানিতে বোমাটি তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গামানুষ জাতির ইন্দ্রিয়ানুভূতি লুপ্ত হয়ে গেল।

> '' এই গল্পে পরশুরামের বিজ্ঞানমনস্কতা সবার উপরে টেক্কা দিয়েছে। এ-গল্প শুধু তিনিই লিখতে পারেন। এবং তাঁর প্রথম যুগের রচনার তুলনায় এর উৎকর্ষতা বিন্দুমাত্র কম নয়—বরং বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন বিশ্বচেতনায় গল্পের পটভূমি সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। পরশুরামের বলিষ্ঠ বিশ্বাস ও আশাবাদ এই গল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পলকে-প্রলয় ঘটানো চরম দুর্যোগের দিনেও তিনি বিশ্ববিধানে অবিচলিত বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছেন।''[১২১খ]

'মাঙ্গলিক' গল্পে মঙ্গল গ্রহ থেকে আসা জ্ঞানে-বুদ্ধিতে মানুষের থেকে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ 'মাঙ্গলিকের'মুখ দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতি, স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ইত্যাদি নিয়ে পরশুরাম তার নিজের ভাবনাকেই ব্যক্ত করেছেন :

> ''এই পৃথিবীতে রাষ্ট্রচালনার দুরকম নীতি আছে দেখছি। একটি হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র অর্থাৎ একজন বা একদল ধূর্তলোক সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করে রাখে, তাদের শাসন আর সবাই ভেড়ার পালের মতন মেনে নেয়। অন্য রীতি হচ্ছে লোকতন্ত্র, অর্থাৎ জনসাধারণ যাদের নির্বাচন করে তারাই রাষ্ট্র চালায়। কিন্তু নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে বিস্তর অকর্মন্য আর দুশ্চরিত্র লোক থাকে। দেশের অধিকাংশ লোক যদি সাধু বুদ্ধিমান হত তবে লোকতন্ত্রে মোটামুটি কাজ চলত। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এখনও কাঁচা আর চরিত্রেও বিস্তর গলদ আছে। এমন অবস্থায় স্বৈরতন্ত্র আর লোকতন্ত্র দুটোই তোমাদের পক্ষে অনিষ্ঠকর। তোমরা মনে কর, স্বাধীনতা পেয়েছ, ছাই পেয়েছ।''[১২২]

‘গগন-চটি’ গল্পটি অনেকটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মত। তবে এই গল্পটি আদ্যন্ত রসে পরিপূর্ণ। একটি মহাজাগতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে জ্যোতিষ শাস্ত্র ও আধুনিক বিজ্ঞানের নানা অনুমান এবং তার কৌতুককর পরিণতিই এ গল্পটির বিষয়। আকাশে এক নতুন জ্যোতিষ্কের উদয় হয়েছে। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছে। আবুবকর দর্জির মত সাধারণ মানুষের মনে হল—ওটা কাটারি নয়, এর আকার পয়জারের মত এবং নিশ্চয় ইহা জমিদার মল্লিকবাবুদের শখের ব্যাপার, তাঁরা আকাশে ফানুস উড়িয়ে থাকবেন। কিন্তু না সেটা ফানুস নয় জ্যোতিষীরা অনুমান করলেন এটি একটি গ্রহাণু বা অ্যাষ্টেরয়েড। খুব শীঘ্রই চন্দ্রের সঙ্গে পৃথিবীর ধাক্কা খেয়ে এই দুই জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর উপর হুড়মুড় খেয়ে পড়বে এবং পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। এরকম সম্ভাবনার আতঙ্কে মানুষের মনে যে নানা ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তাই এই গল্পটিকে কৌতুককর করে তুলেছে। সামগ্রিক ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েও যে মানুষ দম্ভ, ধাপ্পাবাজী, আত্মপ্রচার, সত্য গোপণ প্রভৃতি বদভ্যাসগুলিকে ত্যাগ করতে পারে না তা পরিস্ফুট হয়েছে গল্পটিতে। শঙ্করাচার্যের উত্তরাধিকার এই দুঃসময়েও পঞ্চাশ লক্ষ কপি পুস্তক বিক্রি করে আত্মপ্রচারে ব্যস্ত, নিজে সত্য গোপন করে অপরকে সত্য প্রকাশে উৎসাহিত করেছেন। এই মহা দুর্দিনে পাকিস্তান ও ভারত বৈরী ত্যাগ করে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল, লেকিন আগে কাশ্মীর চাই। বৃহৎ চতুঃশক্তি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের শাসকবর্গ গত পঞ্চাশ বৎসরে যত কুকর্ম করেছেন তার ফিরিস্তি দিয়ে white book প্রকাশ করলেন এবং একযোগে ঘোষণা করলেন—সব মানুষ ভাই ভাই, কিছুমাত্র বিবাদ নাই।

এই প্রচন্ড বিক্ষোভের মধ্যে শুধু একজনের চিত্তে কোনরকম চিত্তচাঞ্চল্য দেখা গেল না। ইনি হচ্ছেন হাটখোলার ভুবনেশ্বরী দেবী। তার বয়শ আশি হলেও প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী। আসন্ন পৃথিবীর ধ্বংস নিয়ে যখন সকলে প্রচন্ড আতঙ্কিত তখন তার সোজা সাপটা মন্তব্য :

> ‘‘গগন-চটি না ঢেঁকি, আকাশে লাখ লাখ তারা আছে, আর একটা না হয় এল, তাতে হয়েছে কি? তোরা বললেই প্রলয় হবে? মরতে এখন ঢের দেরি রে, এখনই হা হুতোশ করছিস কেন? ভগবান আছে কি করতে? ‘আমায় না হইলে ত্রি ভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ’ত যে মিছে’—রবি ঠাকুরের এই গান শুনিস নি? মানুষকেই যদি ঝারে বংশ লোপাট করে ফেলেন তবে ভগবানের আর বেঁচে থেকে সুখ কি? লীলাখেলা করবেন কাকে নিয়ে? যা যা নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমো গে।’’[১২৩]

সত্যি সত্যি পৃথিবী আর ধ্বংস হল না। কিছুদিনের মধ্যে গগন চটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। একজন সহজ সরল রমণীর সাধারণ জীবনবোধ যেভাবে বিষয়টিকে দেখেছে তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বড় বড় পন্ডিতদের প্রতি লেখকের মৃদু কটাক্ষ :

> ''এই সুলিখিত, সু গঠিত বক্রোক্তিপূর্ণ রচনাটি বৈজ্ঞানিক বাহাদুরির উপর কৌতুক হাস্যের রশ্মী বিকিরণ করিয়াছে এবং একজন সাধারণ রমণীর সহজ ধর্ম বিশ্বাসের মধ্য দিয়া যাজক সম্প্রদায়ের জারিজুরিকে লজ্জা দিয়াছে। বিজ্ঞনীরা এত সূক্ষ্ম হিসাব করিতে পারেন কিন্তু যে অমোঘ নিয়মে গগন-চটি পিছনে সরিয়া গেল সেই অঙ্ক কষিতে পারেন নাই।''[১২৪]

এ গল্পে পরশুরামের ব্যঙ্গের লক্ষ্য সারা পৃথিবীর সভ্যতাভিমানী দেশসমূহ। একদিকে ভারতীয় আইনের অন্তঃসারশূন্যতা অন্যদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের নির্লজ্জ আত্মপ্রতারণাকে বিদ্রূপ করেছেন পরশুরাম এখানে।

(১৩) তারুণ্যের বিলাসিতা ও অসঙ্গতিমূলক গল্প :

পরশুরাম তাঁর বেশ কিছু গল্পে তারুণ্যের রুচি বিকৃতি, উচ্ছ্বাসের অসংযমকে ব্যঙ্গ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের তৃতীয় দশকে এবং চতুর্থ দশকের প্রথম দিকে বেশ কিছু ধনী শিক্ষিত মানুষ ছিল যাদের তরুণ প্রজন্ম উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিরাট অর্থসম্পদের জোড়ে নিজেদের খেয়াল খুশিমত জীবন বিলাসের পরাকাষ্ঠা দেখাত। আলোচ্য গল্পে সেই সমস্ত তরুণদের জীবনযাপনের নানা অসঙ্গতিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক কিছু গল্পে। এ ধরণের দুটি গল্প হল 'কচিসংসদ' ও 'রাতারাতি'।

'কচি সংসদ' গল্পের প্রধান চরিত্র বছর চব্বিশ পঁচিশের পিতৃমাতৃহীন কেষ্ট। উত্তরাধিকার সূত্রে সে প্রচুর সম্পত্তির মালিক। তারুণ্যের উচ্ছ্বাসবশত সে কচি সংসদ নামে একটি দল গড়েছে। তরুণ বয়সের ছেলেমেয়েরা এই দলের সদস্য। কেষ্ট এই দলের প্রেসিডেন্ট। লেখক কেষ্টর চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

> ''তার মাথার চুল কদম্ব কেশরের মত ছাটা, গোঁফ নাই কিন্তু ঠোটের নীচে ছোট একগাছা দাঁড়ি আছে, গায়ে সবুজ রঙের খাটো জামা—তাতে বড় বড় সাদা ছিট, কোমরের বেল্ট, মালকোচা মারা বেগনী রঙের ধূতি, পায়ে পট্টি ও বুট। হাতে একটি মোটা লাঠি ও বা কোঁতকা, পিঠে কাম্বিসের ন্যাপ স্যাক স্ট্রাপ দিয়া বাঁধা।''[১২৫]

কেষ্ট চিরাচরিত প্রথার প্রেম বিবাহের বিরোধী। সে মনে করে প্রেম একটা ধাপ্পাবাজী। যার দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে ঠকায়। এক্ষেত্রে বিয়ের ব্যাপারে একটা নতুন ধরণের সিষ্টেম সে আবিষ্কার করতে চায়। সে মনে করে পুরো প্রেম বিবিক্ত কোর্টশিপ বিবাহের ব্যাপারে আদর্শ পন্থা। তবে মাঝখানে একজন অভিজ্ঞ 'মিডল ম্যান'-এর উপস্থিতি চাই। সে দুজনের মধ্যে কথাবার্তা বলে দুজনের অভ্যাস, মতামত, রুচি এইসব বিচার বিবেচনা করে বিবাহের ব্যাপারে মতামত দেবে, তারপর হবে বিবাহ। অথচ এই কেষ্টই এই পদ্ধতিতে তার বিবাহের কোর্টশিপ চলাকালীন প্রায় কোন বিষয়েই সহমত না হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে পাত্রী পদ্মকে বিবাহের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল তা যথেষ্ট কৌতুককর। সেই ব্যাকুলতার বিবরণ দিয়েছেন কথকপত্নী :

> ''রাত বারোটার সময় দেখি—কেষ্ট টিপিটিপি আসছে। তার মুখ কাঁদো কাঁদো, চাউনি পাগলের মতন। টুনি-দি বললে—কেষ্ট, কি হয়েছে? কেষ্ট বললে, পদ্মর সঙ্গে বে না হ'লে সে আর এ প্রাণ রাখবে না, তার আর তর সইছে না, হয় পদ্ম—নয় কি একটা অ্যাসিড।''[১২৬]

'কচি সংসদ' গল্পটিতে লেখক সংলাপ ও সিচুয়েশন সৃষ্টির চমকের মধ্য দিয়ে হাস্যরস জমিয়ে তুলেছেন। দার্জিলিংএর মুন সাইন ভিলায় কচিসংসদের সদস্যদের সমবেত হওয়া, কেষ্ট-ব্রজেন-পদ্মর-হাইকোর্টশিপ ব্যবস্থা, কেষ্টর রাত বারোটায় টুনি দিদির ঘরের কাছে টিপিটিপি আগমন ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে কৌতুকরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা। ব্রজেনের স্ত্রীর মুখে 'হোয়াট-হোয়াট-হোয়াট', হোয়াট ইয়ে, হ্যাং ডালহৌসী'—এমন সব বাংলা মেশানো ভাঙ্গা বিকৃত ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ, কচিসংসদ সদস্যদের নাম যথাক্রমে শিহরণ সেন, বিগলিত ব্যানার্জী, অকিঞ্চিৎকর, হুতাশ হালদার, দোদুল দে, লালিমা পাল(পুং) নিঃসন্দেহে হাসির খোরাক হয়ে ওঠে।

'রাতারাতি' গল্পে এরকমই একটি চরিত্র কার্তিক। কার্তিক স্বপ্ন দেখে এমন এক নারীর ''যে বল্লরী বাঁড়ুজ্জ্যের মত রূপসী, মিসেস চৌবের মত সাহসী, জিগীষা দেবীর মত লেখিকা, মেজদির ননদের মত রসিকা, লোটি রায়ের মত গাইয়ে, ফাখতা খাঁর মতন নাচিয়ে।'' বাবার পছন্দের নেড়ী নামধারি কোন পাত্রীকে যে সে বিবাহ করবে না তা বলাই বাহুল্য। অথচ এই নেড়ীই কীভাবে তার মানসপ্রিয়া হয়ে উঠল তার সরস বর্ণনা রয়েছে গল্পটিতে।

'রাতারাতি' গল্পে হাস্যরস থাকলেও তা রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। সংলাপের মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির মুনশিয়ানা গল্পটিতে চোখে পড়ে:

> ''ম্যানেজার। জানেন, এটা হচ্ছে অ্যাংলো-মোগলাই কেফ?

বাঁটলো ভুল উচ্চারণ বরদাস্ত করিতে পারে না। বলিল—'কেফ নয়, কাফে।'

ম্যানেজার। ওই হ'ল জানেন, শিক্ষিত লোকের রেন্ডেজ ভোঁশ।

বাঁটলো। রাঁদেভু।

বারবার বাধা পাইয়া ম্যানেজার চটিয়া উঠিল। বলিল—'আরে থাম ডেঁপো ছোকরা। ডেভিল মামলেট কোপ্তা কোর্মা দেরাই বেচে বুড়িয়ে গেলুম, আর ইনি এলেন উশ্চারণ শেখাতে।''[১২৭]

পরশুরামের হাসি বুদ্ধিপ্রধান তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ব্যঙ্গধর্মী, অশ্রু তার সখা নয়। তা সত্ত্বেও এমন কিছু গল্প তিনি লিখেছেন যেখানে নিহিত রয়েছে প্রচ্ছন্ন অশ্রু। 'ভূষণ পাল', 'দাঁড়কাগ', 'কৃষ্ণকলি' ইত্যাদি গল্পগুলিতে রয়েছে অশ্রুর আভাস।

এছাড়াও পরশুরাম কিছু কিছু গল্প লিখেছেন যেগুলি কোন বিশেষ শ্রেণীতে পড়ে না। কিন্তু হাস্যরসের গল্প হিসেবে প্রত্যেকটি গল্পেরই কিছু কিছু বিশিষ্টতা রয়েছে। 'ভূষণ পাল', 'রাজ ভোগ' ইত্যাদি গল্পগুলি এই শ্রেণীর। আইনের দৃষ্টিতে একজন খুনীর আসামী ফাঁসির দন্ড পেলেও একজন শিল্পী কীভাবে তার মধ্যে মহত্ব আবিষ্কার করতে পারেন তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ **'ভূষণ পাল'** গল্পটি। ভূষণ পাল নবীনকে খুন করার দায়ে ফাঁসীর সাজা প্রাপ্ত। এ বিষয়ে তাঁর কোন খেঁদ নেই। উচ্চ আদালতে আপিলও সে করতে চায় না। কিন্তু মরে যাবার আগে সে তাঁর পোষা কুকুর ভুলোর একটা ব্যবস্থা করতে চায়। এবং সে যাকে খুন করেছে সেই নবীনের স্ত্রীকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা দিতে চায় নবীনের খুকী গোলাপীকে মানুষ করবার জন্য। না, প্রায়শ্চিত্ত করবার কোন গরজ নেই তাঁর। শুধু অন্তরের তীব্র গরজ থেকেই সে একাজ করতে চায়। মৃত্যু সব সময়ই বেদনাদায়ক। নিজের মৃত্যুর প্রসঙ্গ বোধহয় তার চেয়েও বেশী বেদনাদায়ক। অথচ ভূষণ পাল সম্পূর্ণ সচেতন মন নিয়ে জেনেছে যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন। তাই নিজের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা নিজেই করে রাখতে চেয়েছে :

''আর একটা কথা—ভটচাজ মশাইকে জিজ্ঞেস করে আমার শ্রাদ্ধের খরচটা তাকে দিও। তিনিই যা হয় ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু পঞ্চাশ টাকার বেশি খরচ না হয়।

বিষণ্ন মুখে সাগর বলল, শ্রাদ্ধ হবার যো নেই রে ভূষণ। ভটচাজ বলেছে, অপঘাত মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ হয় না, ফাঁসি যে অপঘাত। তবে একটা প্রাশ্চিত্তির করা খুব দরকার বলেছেন, আর বারোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।

—না, প্রাশ্চিত্তির আর ভূত ভোজন করাতে হবে না।''[১২৮]

ভূষণ পাল যতই স্থিরভাবে এ কথাগুলি বলুক না কেন এর অন্তরালে লুক্কায়িত রয়েছে তীব্র বেদনা যা পাঠকের হৃদয়কেও অশ্রুসিক্ত করে তোলে।

'রাজভোগ' গল্পের হাসিও হিউমার ঘেষা। পতিপুরের রাজা বৃদ্ধা হলেও রসনার লোভ তার এতটুকুও কমেনি। রসনাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে সে হাজির হয়েছে ধর্মতলার অ্যাংলো মোগলাই হোটেলে। ম্যানেজারের কাছ থেকে রকমারি খাবারের বৃত্তান্ত শুনে তার জিভে জল এসে গেছে। কিন্তু এই পর্যন্তই। এককাপ জলে এক চামচ বার্লি সিদ্ধ করে নেবু আর একটু নুন খেয়েই তাকে বিদায় নিতে হয়েছে। কেননা তিনি যে ডিসপেপসিয়ার রুগী। আর এখানেই তার ট্র্যাজেডি। হোটেল ম্যানেজারের ক্ষেত্রেও একথা সত্যি। তার হোটেলে রাজবাহাদুরের পদার্পণে আকস্মিকভাবেই একটি বড় অর্ডারের প্রত্যাশা তৈরী হয়েছিল তার মনে। সে প্রত্যাশা থেকেই তিনি রকমারী খাবারের নানা রেসিপি রাজবাহাদুরকে শুনিয়েছেন। কিন্তু শেষে রাজবাহাদুরের তুচ্ছ অর্ডার পেয়ে তার অর্থ লোভের প্রত্যাশা নিমেষেই ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে।

(৫)

পরশুরামের গল্পগুলি আলোচনার পর নির্দ্বিধায় বলা যায় যে তাঁর গল্পের বহি:রঙ্গ হাসির প্রলেপ মাখানো। কিন্তু মনে রাখতে হবে সে হাসির অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে গভীর জীবনবোধ। পরশুরাম যতই বলুন ''হালকা বিষয় নিয়ে কিছু কিছু লিখেছি'' কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় তাঁর গল্পগুলি হয়ে উঠেছে ব্যঙ্গচ্ছলে গভীর জীবন ভাবনার গল্প। রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধ, স্বদেশভাবনা, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ তাঁর গল্পের একটি বড় জায়গা জুড়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে যে চরিত্র নির্ভর ব্যঙ্গসাহিত্য গড়ে উঠেছিল পরশুরাম সেই ধারায় পরিবর্তন এনে সামাজিক ব্যঙ্গপ্রিয়তার সূচনা করলেন। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল বলেই গ্রামবাংলার ধীরলয়ে বয়ে চলা সমাজ, যে সমাজ শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা অঙ্কণ করেছেন সেই সমাজ উপেক্ষিত থেকেছে পরশুরামের গল্পে। একটু উল্টো দিক থেকে দেখে সমাজ দেহে নানা ভ্রান্তি ও ব্যাধির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি মানুষকে সচেতন করেছেন। শুধু সচেতন করাই নয় কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাধিমুক্তির পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। পরশুরাম গবেষক উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যয় তাই মন্তব্য করেছেন :

''তাঁর গল্পে সমাজ ও জীবনের উপরিতলের একান্ত সাময়িক কোন সমস্যা কখনোই ব্যঙ্গের বিষয় হয়নি। সামাজিক বা চারিত্রিক অসংগতির গভীরতম কারণটিকে ব্যঙ্গ করাই পরশুরামের লক্ষ্য।''[১২৯]

পরশুরাম বাংলা ছোটগল্পের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্প লেখার মাধ্যমে। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটির প্রথম প্রকাশ ১৯২২ খ্রী: (মাঘ ১৩২৯) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। এরপর টানা দশবছর অর্থাৎ ১৯৩২ সাল পর্যন্ত একটানা গল্প লিখেছেন। এই সময় রচিত হয়েছে 'গড্ডলিকা' (১৯২৪), ও 'কজ্জলি'(১৯২৮) গল্পগ্রন্থের সমস্ত গল্প এবং 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পগ্রন্থের 'হনুমানের স্বপ্ন', 'পুনর্মিলন', 'উপেক্ষিত', 'উপেক্ষিতা', 'গুরুবিদায়', 'মহেশের মহাযাত্রা', 'রাতারাতি', 'প্রেমচক্র' প্রভৃতি গল্পগুলি। এর পরবর্তী দশ বছর পরশুরাম গল্প লেখা বন্ধ করে রাখেন। তিনি আবার গল্পের আসরে অবতীর্ণ হন ১৯৪২ সালে এবং আমৃত্যু লিখে চলেন। পরশুরামের মৃত্যু হয় ১৯৬০ সালে। কালচিত্র উপস্থাপনের নিরিখে পরশুরামের গল্পে দুটি পর্ব—প্রথম পর্বের গল্পগুলিতে রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙ্গালী সমাজ-জীবন। অন্যদিকে দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সমাজ ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙ্গালীর নাগরিক সমাজ। অর্থাৎ সময়ের দিক থেকে পরশুরামের গল্পগুলি একটি গুরুত্বপুর্ণ সময়ের দলিল। দু- দুটি বিশ্বযুদ্ধ বাঙ্গালী সমাজের ভিত্তিমূলে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। অতি দ্রুত বাঙ্গালী সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছিল। এই পরিবর্তন বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনকে যতটা নাড়া দিয়েছিল তার থেকে অনেক বেশী নাড়া দিয়েছিল বাংলাদেশের শহুরে জীবনকে। বিশেষ করে কলকাতার নগর জীবনকে। এই পরিবর্তনের স্রোতে নানারকম অসঙ্গতি শহুরে বাঙ্গালী সমাজের জীবনে প্রবেশ করেছিল। পরশুরাম তাঁর গল্পের ক্যানভাসে এই অসঙ্গতির চিত্র অঙ্কণ করেছেন। ব্যঙ্গের তুলিতে শহুরে জীবনের নানা অসঙ্গতির চিত্র অঙ্কণ করতে গিয়ে পরশুরামের গল্পগুলিও হয়ে উঠেছে নাগরিক জীবনের গল্প। বিশেষ করে কলকাতার নাগরিক জীবনের ছবি। শুধু বাঙ্গালী নয় বহু অবাঙ্গালী মানুষের জীবনচিত্রও উঠে এসেছে পরশুরামের গল্পে।

পরশুরামের গল্পের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাঁর চরিত্র চিত্রণের বিশিষ্টতা। রবীন্দ্রনাথেরও পরশুরামের চরিত্র সৃষ্টির এই বিশিষ্টতা নজরে এসেছিল। তাই পরশুরামের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গড্ডলিকা' (১৯২৪) পড়ে তিনি প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন এই বলে যে :

''বইখানি চরিত্র চিত্রশালা।...আমি দেখিলাম তিনি মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।''[১৩০]

পরশুরামের চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য শুধু 'গড্ডলিকা'র চরিত্রগুলি সম্পর্কে নয় পরশুরামের প্রায় সকল গল্পের সকল চরিত্র সম্পর্কে সত্যি। পরশুরামের অঙ্কিত চরিত্রগুলি বাস্তবের অত্যন্ত কাছাকাছি। এমনিতে দীনবন্ধুর মত সামাজিক অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন সে কথা :

''জীবনে আমি খুব কম লোকের সঙ্গে মিশেছি। তাই আমার অভিজ্ঞতাও খুব কম। কর্মক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে মিশেছি তাদের মধ্যে বেশীরভাগ ব্যবসায়ী আর দোকানদার। লিখতে গেলে অনেক বেশী দেখতে হয়। আমার যা দেখা তা ঐ রামায়ণ-মহাভারত, পুঁথিপত্রের মধ্য দিয়ে দেখা।''[১৩১]

জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে হয়তো পরশুরামের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না। কিন্তু তাঁর দৃষ্টির প্রখরতা ছিল। যে কোন ব্যঙ্গ সাহিত্যিকেরই যা অন্যতম স্বভাব বৈশিষ্ট্য। একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে পরশুরাম তাঁর চরিত্রগুলিকে কল্পনার জগৎ থেকে উঠিয়ে এনেছেন। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি প্রায় সবই তার চোখে দেখা। তিনি এমনভাবে সে চরিত্রগুলিতে শিল্পীর তুলির আচর দিয়েছেন যে চেনা চরিত্রগুলিও অচেনা হয়ে উঠেছে। কোন কোন চরিত্রের বাস্তব ভিত্তি তো পরশুরাম নিজেই বলে দিয়েছেন। যেমন 'দাঁড়কাগ' গল্পের মেয়েটি সম্পর্কে পরিমল গোস্বামী উল্লেখ করেছেন :

''রাজশেখর বললেন, 'যুগান্তরে এবারে আপনাকে দাঁড়কাগ দিয়েছিলাম। সত্যিই একটা মেয়েকে দাঁড়কাগ বলা হত।' যতীন্দ্রকুমার যোগ করলেন, 'স্কটিশ চার্চ কলেজের কাছাকাছি থাকত মেয়েটি, রং ছিল তার কালো।''[১৩২]

শুধু 'দাঁড়কাগ' গল্পের মেয়েটিই নয় কচিসংসদ-এর 'কচি', 'নকুড়মামা', অথবা 'গুরুবিদায়' গল্পের খল্বিদংস্বামী এরা প্রত্যেকেই পরশুরামের চোখে দেখা চরিত্র। কিন্তু গল্পে উপস্থাপনের বেলায় এই চরিত্ররাই একটু পাল্টে গেছে। পরশুরাম গবেষক উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন :

''গল্পের লৌকিক চরিত্রেরা পরিচিত সমাজ থেকে উঠে এলেও চিত্রণের সময় পরশুরাম কার্টুনিষ্টের মতো চরিত্রের এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য একটু অতিরঞ্জিত বা বিকৃত করে এঁকেছেন। ফলে চেনা চরিত্রগুলিতে অচেনার আভাস লেগেছে। যখন সেই চরিত্রকে পরশুরাম ব্যঙ্গ করেন, তখন সমাজে তার সমধর্মী মানুষও প্রাণ খুলে হাসতে

পারেন। কারণ অতিরঞ্জনের প্রভাবে বুঝতেই পারেন না যে, তাকেই ব্যঙ্গ করা হল।''[১৩৩]

—পরশুরাম আমাদের চেনাজানা চরিত্রগুলিকেই তাঁর গল্পে নিয়ে এসেছেন নিজস্ব ভঙ্গীতে। কোথাও অতিরঞ্জনের আশ্রয়ে পরশুরাম তাঁর চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। কোথাও অনবদ্য শিল্পকুশলতায় তিনি মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়ে তুলেছেন। প্রমথ চৌধুরী তাই মন্তব্য করেছেন :

''পরশুরামের ছবি আকবার হাত পরিষ্কার। তিনি দুটি চারটি টানে এক একটি লোককে চোখের সম্মুখে খাড়া করেছেন। তাঁর ছবিতে রেখা ও বর্ণের বাহুল্য নেই। তাঁর হাতে প্রতি রেখাটি পরিস্ফুট, প্রতি বর্ণটি যথোচিত।''[১৩৪]

পরশুরাম তাঁর গল্পে বহু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। অবাক হয়ে যেতে হয় সেই চরিত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখে। পৌরাণিক চরিত্র থেকে শুরু করে ব্যবসাদার, চাকুরিজীবী, আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, প্রভৃতি নানা শ্রেণীর চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে পরশুরামের চরিত্র চিত্রশালা। এমনকি মনুষ্যেতর প্রাণীও সেই চিত্রশালায় স্থান করে নিয়েছে। বংশলোচনবাবু, কেদার চাটুয্যে মহাশয়ের মতো চরিত্র তো এই চিত্রশালা থেকেই উঠে এসেছে।

একজন শিল্পী তিনি যে রসেরই কারবারি হোন না কেন তার সর্বাপেক্ষা বড় আয়ুধ হল ভাষা। বিশেষ করে যে শিল্পী হাস্যরসের কারবারি তার ক্ষেত্রে এ কথাটি আরো বেশি করে প্রযোজ্য। এই ভাষার মাধ্যমেই হাস্যরসিক গড়ে তোলেন তাঁর হাস্যরসের জগৎ। হাস্যরসের তীব্রতা তো ভাষা ব্যবহারের সূক্ষ্মতার উপরই নির্ভর করে। শুধু তাই নয় একজন হাস্যরসিকের থেকে আরেকজন হাস্যরসিকের মূল পার্থক্য অনেক সময় এই ভাষা ব্যাবহারের ভিন্নতার উপর ভিত্তি করেই নির্মিত হয়। তাই প্রত্যেক হাস্যরসের শিল্পীর ভাষা ব্যবহারের ভঙ্গিও হয় নিজস্ব। পরশুরামও তাঁর হাস্যরসের গল্পে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব ভঙ্গি নির্মাণ করে নিয়েছেন। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় রাজশেখরের ভাষা প্রসঙ্গে বলেছেন :

''সংযম, শুচিতা ও বিনয়—তিনটি মন্ত্র রাজশেখর অবলম্বন করেছিলেন। ভাষার সংযম, শুচিতা ও বিনয় (ডিসিপ্লিন) তাঁর রচনাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। বস্তুত পক্ষে তিনি একটি স্বতন্ত্র গদ্য—ষ্টাইল সৃষ্টি করেছেন। এই ষ্টাইলের ভিত্তিভূমি মাত্রাজ্ঞান ও সুবুদ্ধি (কমন সেন্স), বিবিক্ততা ও বিচ্ছিত্তি (ডিট্যাচমেন্ট ও ইম্পার্সন্যালিটি), বিনয় (ডিসিপ্লিন) ও বিন্যাসশৃঙ্খলা। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবনরসরসিকতা, গভীর অন্তদৃষ্টি ও অতিসূক্ষ্ম সুমার্জিত রসবোধ।''[১৩৫]

রাজশেখর বসু বরাবরই চলিতভাষা ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিলেন। হয়তো একারণেই তাঁর ব্যবহৃত গদ্য অনেক ক্ষেত্রেই সাধু হয়েও তা চলিত ভাষার মতো। প্রমথনাথ বিশী তাই বলেছেন :

''এমন পরিচ্ছন্ন, বাহুল্যবর্জিত, সুপ্রযুক্ত ভাষা বড় দেখা যায় না। পাঠক-সমাজ যখন সবুজপত্রী ভাষাকে প্রগতির চরম লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছিল, ভেবেছিল সাধু ভাষার আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে নূতন কোন সম্ভাবনা আর তার মধ্যে নেই, তখন গড্ডলিকা কজ্জলীর ভাষা দেখে সকলে চমকে গেল। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতিকে এড়িয়ে সাধুভাষার এই পদক্ষেপ সত্যই বিস্ময়জনক। বস্তুত: পড়বার সময়ে খেয়াল থাকে না এ ভাষা সাধু কি কথ্য, পরে হিসাবে দেখা যায় সাধু ভাষা।''[১৩৬]

অনেকে বলেন চলিত ভাষায় হাস্যরস ঠিক জমে না। হাস্যরসের বাহন সাধুভাষাই হওয়া উচিৎ। প্রমথনাথ বিশী এই মতের সমর্থনকারীদের মধ্যে একজন। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

''হাস্যরস রচনার ভাষা সাধু হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে ভাষার গাম্ভীর্যে আর ভাবের লঘুতায় যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তা হাসির পরিবেশ রচনায় সাহায্য করে। কথ্যভাষার চটুলতা আর হাসির চটুলতায় মিলে যায়, মুহুর্মুহু পাঠকের মনকে দ্বন্দ্বের চকমকি স্ফূরণে আলোকিত ও চকিত করতে পারে না। বিষয়টির বিস্তার অনাবশ্যক, কতকগুলি উদাহরণ দিলেই চলবে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর', রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-কৌতুক, ত্রৈলোক্যনাথ, ইন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের গল্প প্রভৃতির উল্লেখই যথেষ্ট। অনেকে আক্ষেপ করেন বাংলা সাহিত্যে আজকাল যথেষ্ট হাস্যরসের রচনা লিখিত হচ্ছে না। তার অনেক কারণের মধ্যে একটি প্রধান, হাসির রচনা আজ ভ্রষ্টবাহন। সিদ্ধিদাতা গণেশ চটুল মুষিক বাহনে চলাফেরা করতে পারেন, তবে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করবে এমন কার সাধ্য। যে-শুঁড়ের বহর! গভীর গম্ভীরভাব কথ্যভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হলেও, কথ্যভাষায় হাস্যরস! নৈব নৈব চ। এই একটি কারণ যে জন্য পরশুরামের শেষ ছয়খানি গল্পগ্রন্থ কিছু পরিমানে ম্লান। সেগুলির বাহন কথ্যভাষা।''[১৩৭]

কিন্তু প্রমথনাথ বিশীর এই সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীন ভাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ প্রথমত, পরশুরামের শেষ গল্পগ্রন্থে এমন বহু গল্প রয়েছে যেগুলি পরশুরামের খ্যাতির সীমা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ পর্বের গল্পে পরশুরাম চলতি ভাষা ব্যবহার করলেও এ ভাষারও রয়েছে যাদুকরী ক্ষমতা। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন :

''তাঁর বড়ো কৃতিত্ব এই যে, চলিত বাংলার ভিতর থেকে এক নতুন শক্তি আবিষ্কার ও আহরণ করেছেন। এই ভাষার ভিত্তিভূমি যুক্তি ও বিচার। লঘু ও গুরু বিষয়ে সমান সাফল্যের সঙ্গে এই চলিত ভাষাকে রাজশেখর ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভাষার দ্যোতনা ও ইঙ্গিত অসাধারণ, প্রতিটি শব্দ সুনির্বাচিত, প্রতিটি বাক্য ভাবগর্ভ। অল্প কথায় তিনি বিস্তর কথা বলেন, সামান্য ইঙ্গিতে তিনি অনেকটা ভাবকে ব্যক্ত করেন।''[১৩৮]

কোনও সন্দেহ নেই এই বিশেষ ভাষাভঙ্গিই রাজশেখরের গল্পগুলিকে একটি বিশিষ্ট সাহিত্যের সামগ্রী করে তুলেছে।

তবে একথা ঠিক রাজশেখর বসু সাধু ও চলিত যে ভাষাই ব্যবহার করুন তা অনেকটা মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি। এরফলে তাঁর সাধুভাষা সরস ও অতিপরিচিত জনের ভাষা হয়ে উঠেছে। তিনি যখন সাধুভাষায় লেখেন তখন তা রসিকচিত্তে আলোড়ন তোলে তার কথ্যধর্মিতার জন্যই আবার যখন চলিত ভাষায় লেখেন তখনও তা রসিকচিত্তে সমানভাবেই আলোড়ন তোলে।

রাজশেখরের লেখা সাধুভাষার দৃষ্টান্ত :

''হঠাৎ বংশলোচনের মনে একটা কাঁটা খঁচ করিয়া উঠিল। তাঁহার যে এখন পত্নীর সঙ্গে কলহ চলিতেছে। আজ পাঁচ দিন হইল কথা বন্ধ। ইঁহাদের দাম্পত্য কলহ বিনা আড়ম্বরে নিষ্পন্ন হয়। সামান্য একটা উপলক্ষ্য, দু-চারটি নাতিতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, তারপর দিনকতক অহিংস অসহযোগ, বাক্যালাপ বন্ধ, পরিশেষে হঠাৎ একদিন সন্ধি-স্থাপন ও পুনর্মিলন। এরকম প্রায়ই হয়, বিশেষ উদ্‌বেগর কারণ নাই। কিন্তু আপাতত অবস্থাটি সুবিধাজনক নয়। গৃহিণী জন্তু-জানোয়ার মোটেই পছন্দ করেন না। বংশলোচনের একবার কুকুর পোষার শখ হইয়াছিল, কিন্তু গৃহিণীর প্রবল আপত্তিতে তাহা সফল হয় নাই। আজ একে কলহ চলিতেছে। তার উপর ছাগল লইয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না। একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ।''[১৩৯]

রাজশেখরের লেখা চলিত ভাষার দৃষ্টান্ত :

''পরদিন বিকেলে যোগীনের কাছে গেলুম। পান্ডা, কাঙ্গারু, হিপ্পো, কালো রাজহাঁস, সাদা ময়ূর প্রভৃতি সবরকম দুর্লভ প্রাণী দেখা হল। তারপর বাঘ সিংগির খাওয়া দেখছি এমন সময় নজরে পড়ল একটা বাঘ ভাল করে খাচ্ছে না, যেন অরুচি হয়েছে। মাংসের চার দিকে তিন পায়ে খুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে একটু কামড়

দিচ্ছে। যোগীনকে বললুম, আহা, বেচারার একটা পা জখম হয়েছে, খানিকটা মাংস কেউ যেন খাবলে নিয়েছে। গুলি লেগেছিল নাকি?

যোগীন বললে, গুলি লাগেনি। বাঘটির নাম রামখেলাওন, এর ইতিহাস বড় করুণ। পাশের বাঘিনীটিকে দেখ।

পাশের খাঁচায় দেখলুম একটি খোঁড়া বাঘিনী রয়েছে। এরও অরুচি, কিন্তু তবুও কিছু খাচ্ছে। প্রশ্ন করলুম, দুটোই খোঁড়া দেখছি, কি করে এমন হল?

যোগীন বললে, এই বাঘিনীটির নাম রামপিয়ারী। রামখেলাওন আর রামপিয়ারী দুটোই বছর-দুই আগে গয়া জেলার গড়বড়িয়ার জঙ্গলে ধরা পড়ে। এদের দস্তুর মত মন্ত্র পড়িয়ে বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু মনের মিল হল না, তাই আলাদা খাঁচায় রাখতে হয়েছে।''[১৪০]

রাজশেখর যে ভাষাতেই লিখুন না কেন কৌতুকের সামগ্রী হতে তার বিন্দুমাত্র বাধে না। এমনকি বিজ্ঞানের বিষয়ও সহজবোধ্য ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এর বড় আরেকটি কারণ আবিষ্কার করেছেন অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন :

''রাজশেখর বসুর কৌতুকরস শব্দক্রীড়া বা শব্দের মারপ্যাঁচের উপর নির্ভর করে না। তা বুদ্ধিগ্রাহ্য, সহজবোধ্য, মননজাত। আমাদের জীবনের বহু সুলভ ভ্রান্তি ও অহমিকার উপর তাঁর বিদ্বেষহীন পরিহাস ও সহনশীলতা তাঁর রচনায় দেখা যায়। তাই তাঁর ভাষা বিদ্রূপে নিষ্ঠুর, আক্রমণে নির্মম, উষ্মায় উত্তপ্ত নয়। তা পরিহাস স্নিগ্ধ, কোমল ও সংযত।''[১৪১]

ভাষার উপর আশ্চর্য দখল ছিল বলেই ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে ভাষারূপের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছিলেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিল ভারতচন্দ্রের রসিক মন। 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' তার কিছু কিছু কথা তো প্রবাদে পরিণত হয়েছে। যেমন 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমামি' অথবা 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'। সেরকমই পরশুরামের কিছু কিছু কথা বাঙ্গালী সমাজে প্রবাদ বাক্যের মর্যাদা লাভ করেছে। 'হয়, কিন্তু Zান্তি পার না', 'লড়কে লেঙ্গে ঝুমঝুম্মা, বাবু গন্ডেরীরাম বাটপারিয়ার 'কুছভি নেহি, কুছভি নেহি', ক্যাদার চাটুজ্জের 'ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক'—এই সব উক্তি প্রত্যুক্তিগুলি নির্মাণে পরশুরামের লোকচরিত্র সম্পর্কে যেমন বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি সে বাস্তবজ্ঞানকে প্রকাশ করার জন্য অদ্ভুত ভাষা জ্ঞানেরও পরিচয় মেলে, এই ভাষা যথার্থ অর্থেই ব্যঙ্গরসিকের ভাষা। অজিত দত্ত বলেছেন : ''সে ভাষা ঋজু ও অলংকৃত এবং যথাযথরূপে বক্তব্য প্রকাশের যথার্থ বাহন। রাজশেখরের বাহুল্যবর্জিত আবেগহীন নিরপেক্ষ রচনার জন্য এ ধরণের গদ্যেরই প্রয়োজন ছিল।'' [১৪২]

পরশুরামের গল্পগুলি পড়তে পড়তে অলাদাভাবে এগুলির বৈঠকী মেজাজের দিকটি বিশেষভাবে নজরে পড়ে। তাঁর বহু গল্পে বৈঠকী রীতি অনুসৃত হয়েছে। গল্পকথনের অন্যতম কৌশল এটি। গল্পের মধ্যে গল্প এই রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গল্পকথকও থাকেন একাধিক। শ্রোতার উপস্থিতিতে শ্রোতৃমন্ডলী পরিবেষ্টিত হয়ে একজন কথক গল্প শুরু করলেও পরবর্তীতে আরো গল্পকথক হাজির হন। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ গল্পকথক হিসেবে উঠে আসে অথবা অদৃশ্য কোন গল্পকথকের উপর গল্পকথনের দায়িত্ব দিয়ে মূল গল্পকথক কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন। এবং গল্পের শেষে আবার তিনি হাজির হন। এবং গল্প শেষ করেন। তবে অনেক বৈঠকী গল্পই রয়েছে যেখানে গল্প শুরুর কথক এবং মূল গল্পের বক্তা ভিন্ন ব্যক্তি। বাংলা সাহিত্যে অনেক ছোটগল্পকারই গল্পকথনের এই বৈঠকী রীতিটিকে গ্রহণ করেছেন। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলিতে এই বৈঠকী রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। তবে প্রথম ব্যাপকভাবে ও সার্থকভাবে এই রীতির ব্যবহার করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। বৈঠকী রীতির ব্যবহারে রাজশেখর বসু তাঁরই সার্থক উত্তরাধিকারী। রাজশেখর বসুর গল্পে যে বৈঠকখানাগুলির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি হল :

১) রায়বাহাদুর জমিদার বংশলোচন বাবুর বৈঠকখানা। এই বৈঠকের সদস্যরা হলেন বংশলোচন বাবু, বিনোদ উকিল, নগেন, উদয়, বৃদ্ধ কেদার চাটুজ্যে ;

২) দিল্লীর গোল মার্কেটের গলির মোড়ে কালীবাবুর 'ক্যালকাটা টি ক্যাবিন' এবং সেই বৈঠকের সদস্য প্রবাসী বাঙ্গালী বৃদ্ধ রামতারণ মুখুজ্যে, স্কুল মাষ্টার কপিল গুস্ক, ব্যাঙ্কের কেরাণী বীরেশ্বর সিংগি, রিপোর্টার অতুল গুপ্ত এবং জটাধর বক্শী;

৩) গোপালবাবুর বাড়িতে সান্ধ্য আড্ডার বৈঠক এবং তাঁর বন্ধু প্রফেসর সিদ্ধিনাথ, শ্যালিকা অমিতা ও তাঁর স্বামী রমেশ ডাক্তার এবং গোপালবাবুর পত্নী নমিতা;

৪) যতীশ মিত্রের আড্ডা এবং তাঁর সদস্য বৃদ্ধ পিনাকী সর্বজ্ঞ, তার্কিক উপেন দত্ত, ললিত সান্ডেল এবং সাহিত্যিক যতীশ মিত্তির এবং অনিয়মিত সদস্য ভূপতি মুখুজ্যে।

৫) ক্যালকাটা ফিজিসার্জিক্যাল ক্লাবের সাপ্তাহিক সান্ধ্য বৈঠক (যদু ডাক্তারের পেশেন্ট)।

এছাড়াও পরশুরামের আরো অনেকগুলি গল্প রয়েছে যেখানে প্রতিষ্ঠিত কোন বৈঠকখানা না থাকলেও সে গল্পগুলিতেও বৈঠকী মেজাজ অনুভূত হয়। 'একগুঁয়ে বার্থা', 'কামরূপিণী' 'ধনুমামার হাসি', 'ভরতের ঝুমঝুমি', 'গুপী সাহেব, 'প্রেম চক্র', 'চিকিৎসা সঙ্কট', 'বিরিঞ্চিবাবা', 'রামরাজ্য', 'তিন বিধাতা', 'চিরঞ্জীব', 'দীনেশের ভাগ্য', 'শোনাকথা', 'সত্যসন্ধ বিনায়ক' প্রভৃতি গল্পগুলি এ ধরণের গল্প।

বাংলা সাহিত্যের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় যে সমস্ত কথাকার তাদের গল্পে বৈঠকী রীতি ব্যবহার করেছেন তারা ব্যঙ্গ সাহিত্যিক হিসেবেও সমান খ্যাত। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি সকলের সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য। পরশুরামও তাঁর গল্পে ব্যঙ্গসৃষ্টির একটি কৌশল হিসেবে বৈঠকী গল্পকে ব্যবহার করেছেন। রাজশেখরের অনেক গল্পই তো আড্ডার আলোচনা থেকে আরম্ভ হয়েছে। তাহলে কি রঙ্গ-ব্যঙ্গের সৃষ্টির সঙ্গে বৈঠকী গল্পের কোন যোগ আছে? আসলে বৈঠকী গল্পে ব্যঙ্গের বিষয়কে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। বিভিন্ন কৌণিক দূরত্বে ব্যঙ্গের রশ্মিকে নিক্ষেপ করা যায়। এরফলে ব্যঙ্গ সাহিত্যের উদ্দেশ্য অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়। হয়তো সে কারণেই পরশুরামও তাঁর গল্পে বৈঠকী রীতি গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয় বৈঠকী মেজাজের যে ব্যাপক ও বিচিত্র ব্যবহার তিনি তাঁর গল্পে করেছেন বাংলা সাহিত্যে তা আর কারো গল্পে পাওয়া যায় না।

পরশুরাম হাস্যরসিক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আবির্ভাবলগ্নেই পরশুরাম একথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন পাঠককে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাজশেখরের আবির্ভাবে বলেছেন : ''সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে বঙ্গ-সাহিত্যে একজন প্রথম শ্রেণীর হাস্যরসিক দেখা দিয়াছেন।''[১৪৩] আবির্ভাবলগ্নে রাজশেখর বসু তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে হাস্যরসিকের যে প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন গল্প লেখার শেষদিন পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এ যে সরসতার পরিচয় আছে জীবনের শেষের দিকের গল্পগুলিও তেমনি সমান সরস। কিন্তু কেমন ধরণের হাস্যরসিক তিনি? নিছক কৌতুক সৃষ্টি করা নিশ্চয়ই তাঁর হাসির উদ্দশ্য ছিল না। তিনি নিজে যতই বলুন : ''পরিহাস ছাড়া আর কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে লিখিনি। কখনও কোন লোককে লক্ষ্য করে আক্রমণের জন্য কিছু লিখিনি।...'' [১৪৪] একথা দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করা যায় না। উদ্দেশ্য তো অবশ্যই ছিল। পরিহাসের স্রোতে সে উদ্দেশ্যকে চালিত করেছেন তিনি। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের কপটতা ও শঠতাকে বিদ্রূপ করেছেন। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড, অথবা 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে বিরিঞ্চিবাবা তো আমাদের ধর্মের নামে ভন্ডামীর প্রতিই কটাক্ষপাত। শুধু 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' অথবা 'বিরিঞ্চিবাবা' নয় রাজশেখর তাঁর বিভিন্ন গল্পে মানুষের অসাধুতা, কপটতা, মূর্খতা, সংস্কারাচ্ছন্নতা ও নানা প্রকার চারিত্রিক অসঙ্গতিকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছেন। অজিত দত্ত যথার্থই বলেছেন :

''আমাদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের এমন দিক অল্পই আছে, যে দিকে রাজশেখরের মনন ও চিন্তা কখনো ব্যঙ্গগল্পরূপে কখনো যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত না হয়েছে।''[১৪৫]

যথার্থ অর্থেই রাজশেখর satirist. বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ট satirist তিনি। সমাজে যখন প্রবল সংকট ঘনীভূত হয়ে আসে, নানা আবর্জনায় সমাজের চলার পথ হয় রুদ্ধ, বিষাক্ত বায়ুতে যখন সমাজের আকাশ বাতাস দূষিত হয়ে ওঠে তখনই আবির্ভূত হন satirist. হাস্যরসের সঙ্গে বিদ্রূপ-বিষ মিশিয়ে পরিবেশন করেন তিনি। এ কাজে যে শিল্পী যত বেশী সফল সে তত বড় satirist. বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসুও এ রকমই এক প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হাতে ছিল তার পরশুরামের কুঠার। সেই কুঠার দিয়ে সমাজের সমস্ত জঞ্জালের উপর খড়গহস্ত হয়েছিলেন তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখনিতে এসেছে বিদ্রূপ। তাঁর হাসি তাই satirist-এর হাসি। এ হাসি যতটা সহানুভূতির রসে স্নিগ্ধ তার থেকে অনেক বেশী বিদ্রূপের কষে কষায়িত। একজন উচ্চমানের satirist-এর যে ধরণের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি থাকা দরকার রাজশেখরের তা ছিল।

তবে একথাও মনে রাখা দরকার যে রাজশেখর বসু যে Satire রচনা করেছেন সেখানে প্রচুর হাসির উপাদান থাকলেও কোথাও উচ্ছ্বাস নেই, বাড়াবাড়ি নেই, হিংস্রতা তো নেইই। আসলে রাজশেখরের ব্যক্তিগতভাবে খুব চাপা স্বভাবের ছিলেন। কোন বিষয়েই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়তেন না। সাহিত্য রচনার সময়ও তাঁর এই স্বভাব তাঁকে পরিচালিত করেছে। পরিমল গোস্বামী এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

''তিনি খুব ধীরস্থিরভাবে সব লক্ষ্য করেছেন, মনে মনে কৌতুক অনুভব করেছেন এবং তীব্র বিদ্রূপের বিষয়কেও কৌতুকে মুড়ে গল্প রচনা করেছেন। তাঁর মনোজগতে যত ঝড়ই উঠুক, তা অতি গভীর দেশে চাপা থাকত। বাইরে যেটুকু প্রকাশ, তা শান্ত, সংযত এবং কাউকে আক্রমণ করা বা আঘাত দেবার জন্য তিনি কলম ধরেননি। তাঁর মানস ধর্ম বিশ্লেষণ করলেও বিজ্ঞান ও সাহিত্য পঞ্চাশ-পঞ্চাশ অনুপাতে পাওয়া যাবে। সমাজকে বা মানুষকে তিনি বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছেন এবং সেই দেখাকে তিনি রসসমৃদ্ধ করেছেন তাঁর শিল্পীর মন দিয়ে।''[১৪৬]

যেমন ধরা যেতে পারে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটির কথা। গল্পটিতে যে একটি বিশেষ সময়ের কিছু মানুষের প্রতারক স্বভাবকে সুনিপুণভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ গল্পের চরিত্র গন্ডেরিরাম বলেছেন : ''সংসারের লোক সব যেন ভেড়ার পাল। এক ভেড়া যদি খাদ্দেমে গির পড়ে তো সবকোই উসিমে ঘুসে''। এখানে মানুষকে ভেড়ার পাল বলার

মধ্যে পরশুরামের ব্যঙ্গটি পরিষ্কার হয়ে যায়। এদিক থেকে গল্পটি একটি উৎকৃষ্ট Satire. কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যায় গল্পের চরিত্ররা প্রতারক হওয়া সত্ত্বেও এদের কারোর উপরই আমাদের বিদ্বেষ জন্মায় না। বরং কৌতুকরসের উৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে এ গল্পের চরিত্রগুলি এবং তাদের সংলাপগুলি মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। সুতরাং যারা বলেন যে ব্যঙ্গের খোঁচাটা প্রধান না হলে এবং চরিত্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগাতে না পারলে এককথায় 'ম্যালিস' থেকে জাত না হলে উচ্চাঙ্গের Satire হয় না তারা রাজশেখরের এ গল্পগুলি থেকে একটু ভিন্ন ধারণা পেতে পারেন। মনে রাখতে হবে রাজশেখর satirist ছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর Satire তীব্র কৌতুকের রঙ মাখানো। পরিমল গোস্বামী বলেছেন :

> ''তাঁর হাতে স্যাটায়ারিষ্টের চাবুক ছিল না, ছিল ইক্ষুদন্ড, তা দিয়ে আঘাতের ভঙ্গিতে তার রসটাই তাঁর পরিবেশনের লক্ষ্য ছিল। কাঠখড় এবং একমেটে পর্যন্ত স্যাটায়ার, দোমেটে অবস্থা এবং রঙ লাগানো সবই হাস্যরসের।''[১৪৭]

সুতরাং বলা যেতে পারে পরশুরাম শুধু স্যাটায়ারিষ্ট নন। তাঁর গল্পে স্যাটায়ার যেমন আছে তেমনি আছে উইট, হিউমার ও ফানের উপস্থিতি। সব মিলিয়ে একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের শিল্পীর যে গুণগুলি থাকা প্রয়োজন তা পরশুরামের ছিল। জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন :

> ''উইট, হিউমার, ফান ও স্যাটায়ার মিলিয়ে যে হাস্যসরসতা তারই কুশলী শিল্পী পরশুরাম। তাঁর রচনায় রঙ্গব্যঙ্গ যেমন আছে তেমনি আছে বিশুদ্ধ কৌতুকহাস্য।''[১৪৮]

রাজশেখর বসুর হাস্যরসিক শিল্পীসত্তাকে আরও বেশী ক্ষুরধার করেছিল তাঁর অদ্ভুৎ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও বিশ্লেষণী শক্তি। জগৎ ও জীবনকে বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তিনি। হয়তো এ কারণেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজশেখরকে 'সুবুদ্ধি বিলাস' অভিধায় অভিহিত করে বলেছেন :

> '' রসবস্তু যা তার লেখায় আমরা পাই, আর পাই বলেই তাঁকে আমরা ছাড়তে পারি না, তাঁকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রসূত এক অতি অসাধারণ সাধারণ-বুদ্ধি, ইংরাজিতে যাকে বলব 'most uncommon commonsense`বা সুবুদ্ধির জ্যোতি।''?[১৪৯]

—এই প্রতিভা ও দক্ষতা নিয়েই রাজশেখর বসু হয়ে উঠেছেন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ satirist.

উল্লেখসূচি :

১) 'রাজশেখরের ছেলেবেলা', 'শারদীয়া যুগান্তর', শশিশেখর, উদ্ধৃত : অদ্বিতীয় রাজশেখর, অমিতাভ চৌধুরি, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, ২০০১, পৃ. ২।

২) তদেব, পৃ. ২।

৩) তদেব, পৃ. ৩।

৪) ভূমিকা, প্রমথনাথ বিশী, পরশুরাম গল্পসমগ্র, রাজশেখর বসু, সম্পাদনা : দীপঙ্কর বসু, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, পৃ. ১৩।

৫) তদেব, পৃ. ১৪।

৬) অদ্বিতীয় রাজশেখর, অমিতাভ চৌধুরি, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, ২০০১, পৃ. ৫।

৭) কথাসাহিত্য, রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৬০, উদ্ধৃত : ভূমিকা, শ্রী প্রমথনাথ বিশী, পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা : দীপঙ্কর বসু, পৃ. ৯।

৮) ক)ভূমিকা, প্রমথনাথ বিশী, পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা: দীপঙ্কর বসু, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, পৃ. ১১।

খ) সমগ্র স্মৃতিচিত্র, পরিমল গোস্বামী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৭০০০০৯, পৃ. ৩৬০।

গ) তদেব, পৃ. ৩৬৩।

ঘ) তদেব, পৃ. ২৮৩।

৯) অদ্বিতীয় রাজশেখর, অমিতাভ চৌধুরি, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, ২০০১, পৃ. ৮-৯।

১০) তদেব, পৃ. ৮-৯।

১১) বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৩০।

১২) তদেব, পৃ. ৩০।

১৩) পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা: দীপঙ্কর বসু, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নভেম্বর ১৯৯২, পৃ. ৮২০।

১৪) তদেব, পৃ. ৮২১।

১৫) তদেব, পৃ. ৮২২।

১৬) বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৩১।

১৭) তদেব, পৃ. ৩১।

১৮) পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা : দীপঙ্কর বসু, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, পৃ. ৮২০।

১৯) বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ২৯।

২০) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, উদ্ধৃত : অদ্বিতীয় রাজশেখর, অমিতাভ চৌধুরি, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, ২০০১, পৃ. ৩৪।

২১) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ): ২০০৩, পৃ. ২৪৪।

২২) হাস্যরসিক পরশুরাম, শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় প্রকাশ : বইমেলা ১৩৯৯, পৃ. ১।

২৩) ভূমিকা, প্রমথনাথ বিশী, পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা: দীপঙ্কর বসু, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নভেম্বর ১৯৯২, পৃ. ৯।

২৪) বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমারলেন, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৯, পৃ. ৪৪৮।

২৫) কালের পুত্তলিকা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, কার্তিক ১৪০৬, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ১৪৪।

২৬) বাংলা গল্প বিচিত্রা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭৩, পৃ. ৯৭।

২৭) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, পৃ. ৩৮৮।

২৮) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০২, পৃ. ৫৬৪।

২৯) ভূমিকা, প্রমথনাথ বিশী, পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা : দীপঙ্কর বসু, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নভেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১৮।

৩০) পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা : দীপঙ্কর বসু, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, পৃ. ৮২০।

৩১) হাস্যরসিক পরশুরাম, শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় প্রকাশ : বইমেলা ১৩৯৯, পৃ. ৫৫।

৩২) জাবালি, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৩৩) তদেব।

৩৪) তদেব।

৩৫) তদেব।

৩৬) ভূমিকা, প্রমথনাথ বিশী, পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা: দীপঙ্কর বসু, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, পৃ. ২৭।

৩৭) 'দশকরণের বাণপ্রস্থ', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৩৮) তদেব।

৩৯) তদেব।

৪০) তদেব।

৪১) তদেব।

৪২) তদেব।

৪৩) বাংলা গল্প বিচিত্রা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৮।

৪৪) পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা: দীপঙ্কর বসু, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নভেম্বর ১৯৯২, পৃ. ২৭০।

৪৫) তদেব, পৃ. ২৬২।

৪৬) তদেব, পৃ. ৩২৫।

৪৭) 'ভরতের ঝুমঝুমি', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৪৮) তদেব।

৪৯) তদেব।

৫০) হাস্যরসিক পরশুরাম, শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় প্রকাশ : বইমেলা ১৩৯৯, পৃ. ৭০।

৫১) 'যযাতির যরা', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৫২) 'কর্দম মেখলা', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৫৩) 'হনুমানের স্বপ্ন', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৫৪) তদেব।

৫৫) 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৫৬) তদেব

৫৭) বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৪১।

৫৮) 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৫৯) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: ২০০২, পৃ.

৩০১।

৬০) ‘শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৬১) পরশুরামের গল্প: দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা-৯, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর- ২০১১, পৃ. ৩৫।

৬২) পরশুরামের গল্প: দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা-৯, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর-২০১১, পৃ. ৩৫।

৬৩) পরশুরামের গল্প: দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা-৯, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর-২০১১, পৃ. ৩৫।

৬৪) ‘বিরিঞ্চিবাবা’, পরশুরাম গল্পসমগ্র

৬৫) তদেব।

৬৬) তদেব।

৬৭) তদেব।

৬৮) ‘গুরু বিদায়’, পরশুরাম গল্পসমগ্র

৬৯) তদেব।

৭০) তদেব।

৭১) তদেব।

৭২) তদেব।

৭৩) হাস্যরসিক পরশুরাম, শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃ. ৩৬

৭৪) ‘চিকিৎসা সংকট, পরশুরাম গল্পসমগ্র

৭৫) তদেব

৭৬) হাস্যরসিক পরশুরাম, শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় প্রকাশ: বইমেলা১৩৯৯, পৃ. ৩৬।

৭৭) ‘যদু ডাক্তারের পেশেন্ট’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৭৮) ‘দ্বান্দ্বিক কবিতা’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৭৯) তদেব।

৮০) ‘প্রেম চক্র’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৮১) ‘অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৮২) ‘সত্যসন্ধ বিনায়ক’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৮৩) নিধিরামের নির্বন্ধ’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৮৪) ‘অক্রুর সংবাদ’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৮৫) তদেব।

৮৬) তদেব।

৮৭) ‘সিদ্ধিনাথের প্রলাপ’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৮৮) বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমারলেন, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৯, পৃ. ২৯।

৮৯) পরশুরামের গল্প: দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায়, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়া-টোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর- ২০১১, পৃ. ১০৫।

৯০) তদেব, পৃ: ১০৬।

৯১) ‘ভূশন্ডীর মাঠে’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৯২) তদেব।

৯৩) ‘মহেশের মহাযাত্রা’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

৯৪) তদেব।

৯৩) তদেব।

৯৪) তদেব।

৯৫) ভূমিকা, প্রমথনাথ বিশী, পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা: দীপঙ্কর বসু, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭৩, নভেম্বর ১৯৯২, পৃ. ৩০।

৯৬) ‘উপেক্ষিতা’, পরশুরাম গল্প সমগ্র।

৯৭) ‘পরশ পাথর’, পরশুরাম গল্প সমগ্র।

৯৮) ‘তিলোত্তমা’, পরশুরাম গল্প সমগ্র।

৯৯) ‘চিঠিবাজী’, পরশুরাম গল্প সমগ্র।

১০০) তদেব।

১০১) তদেব।

১০২) ‘তিরি চৌধুরী’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১০৩) ‘ধুস্তুরী মায়া’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১০৪) ‘আনন্দীবাঈ’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১০৫) তদেব।

১০৬) তদেব।

১০৭) ‘দাঁড়কাগ’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১০৮) ‘রটন্তীকুমার’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১০৯) তদেব।

১১০) ‘কৃষ্ণকলি’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১১১) ‘জয়হরির জেব্রা’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১১২) ‘লক্ষ্মীর বাহন’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১১৩) ‘দ্বান্দ্বিক কবিতা’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১১৪) ‘দক্ষিণ রায়’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১১৫) তদেব।

১১৬) ‘উলট পুরাণ’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১১৭) তদেব।

১১৮) ‘তিনবিধাতা’, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১১৯) তদেব।

১২০) 'ষষ্ঠীর কৃপা', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১২১) ক) হাস্যরসিক পরশুরাম, শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাই-ভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় প্রকাশ: বইমেলা ১৩৯৯, পৃ. ৭২।

খ) আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, জগদীশ ভট্টাচার্য, ভারবি, ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩, পৃ. ১৮৩।

১২২) 'মাঙ্গলিক', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১২৩) 'গগন-চটি', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১২৪) হাস্যরসিক পরশুরাম, শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় প্রকাশ: বইমেলা ১৩৯৯, পৃ. ৭৬।

১২৫) 'কচি সংসদ', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১২৬) 'কচি সংসদ', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১২৭) 'রাতারাতি', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১২৮) 'ভূষণ পাল', পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১২৯) পরশুরামের গল্প: দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায়, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর- ২০১১, পৃ. ২৯।

১৩০) তদেব, পৃ. ৮২০।

১৩১) অদ্বিতীয় রাজশেখর, অমিতাভ চৌধুরি, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, ২০০১ পৃ. ৮-৯।

১৩২) সমগ্র স্মৃতিচিত্র, পরিমল গোস্বামী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২৮৬।

১৩৩) পরশুরামের গল্প: দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায়, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর- ২০১১, পৃ: ২৩৫।

১৩৪) তদেব, পৃ. ২৩২।

১৩৫) বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকা-তা-৭৩, ২০০৬, পৃ. ৩১৩।

১৩৬) ভূমিকা, প্রমথনাথ বিশী, পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা: দীপঙ্কর বসু, এম. সি

সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নভেম্বর ১৯৯২, পরশুরাম গল্পসমগ্র, পৃ. ২১।

১৩৭) তদেব, পৃ: ২১।

১৩৮) বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকা-তা-৭৩, ২০০৬, পৃ. ৩১৫।

১৩৯) লম্বকর্ণ, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১৪০) নিরামিষাশী বাঘ, পরশুরাম গল্পসমগ্র।

১৪১) বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, ২০০৬, পৃ. ৩১৮।

১৪২) বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, অজিত দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩২১-৩২২।

১৪৩) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ: ২০০১, পৃ. ৩৯৬।

১৪৪) কথাসাহিত্য, রাজশেখর সম্বর্ধনা সংখ্যা, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, উদ্ধৃত: অদ্বিতীয় রাজশেখর, অমিতাভ চৌধুরি, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, ২০০১, পৃ. ৬।

১৪৫) বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, অজিত দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৩১।

১৪৬) সমগ্র স্মৃতিচিত্র, পরিমল গোস্বামী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৩৫৯-৩৬০।

১৪৭) তদেব, পৃ. ৩৬০।

১৪৮) আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, জগদীশ ভট্টাচার্য, ভারবি, ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১৬৭।

১৪৯) বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, অজিত দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি, পৃ. ৩২৬।